সফল সন্তান গড়ার সিক্রেট ফর্মুলা

ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি ফর চিলড্রেন

তাহমিনা রহমান এবং ওয়ালিউল্লাহ ভূঁইয়া

উৎসর্গ
আমাদের বাবা-মা

যারা আমাদের জীবন গড়ার শিক্ষক

সফল সন্তান গড়ার সিক্রেট ফর্মুলা
ওয়ালিউল্লাহ ভূঁইয়া ও তাহমিনা রহমান

বইটি সম্পর্কে

আপনার যদি ১২ বছরের নিচে কোন শিশু থাকে তাহলে এই বইটি আপনার জন্য একটা গাইড হিসাবে কাজ করবে। পাশাপাশি আপনি যদি একজন প্রি-স্কুল বা প্রাইমারি লেভেল শিক্ষক হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার জন্যও কাজে দিবে।

এই বইয়ে আমরা বলেছি কিভাবে আপনি আপনার ৩-১০ বছর বয়সী শিশুকে সাহায্য করবেন যেন সে সফল মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে। একজন আত্মবিশ্বাসী (confident) শিশু কিভাবে তৈরি হয়, শিশুর মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের (self-control) শিক্ষা দিতে পারেন, কিভাবে শিশুরা নিজের লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করতে পারে, ফাইনান্সিয়াল লিটারেসি শিখবে কিভাবে - এই বিষয়গুলো ধাপে ধাপে পুরো গাইডে আমরা তুলে এনেছি।

পুরো বইটিকে বেশ কিছু চ্যাপ্টারে ভাগ করেছি। বিভিন্ন ধাপের কথা উল্লেখ আছে যেগুলো ফলো করলে আপনার সন্তান বা শিক্ষার্থী জীবনে সফল হবে বলে আমরা আশা করি।

কেন বইটি আমরা লিখেছি?

আমরা শিশু আর অভিভাবকদের নিয়ে কাজ করছি গত ১০ বছর ধরে।

অভিভাবকদের সাথে কথা বলে বোঝার চেষ্টা করছি তারা কি চান সন্তানের কাছে, অভিভাবক হিসাবে তাদের চ্যালেঞ্জ, তাদের স্বপ্নগুলো নিয়ে।

সেই সুবাদে আমরা দুই হাজারের বেশি অভিভাবককে জিজ্ঞেস করেছি, "আপনাদের সন্তানের কাছে যদি একটা জিনিস চাওয়ার থাকে তাহলে সেটা কি হবে?"

৮০ ভাগ অভিভাবক বলেছেন, যদি একটা জিনিস চাওয়ার থাকে আমার সন্তানের কাছে, সেটা হল সে যেন বড় হয়ে ভালো মানুষ হয়।

আমরা জিজ্ঞেস করেছি, 'ভালো মানুষ' বলতে কি বুঝাচ্ছেন?

অভিভাবকদের উত্তরটা ছিল এমনঃ 'ভালো মানুষ' বলতে বুঝাচ্ছি এমন মানুষ যে অন্যকে মানুষ হিসাবে মুল্যায়ন করে, তাকে সম্মান করে।

কিন্তু ভালো মানুষ হওয়ার পাশাপাশি সব অভিভাবকই আবার চান সন্তান অর্থনৈতিকভাবে ও সামাজিকভাবে সফল হোক। সেই সফলতার সিঁড়িকে তারা এভাবে দেখেন - সন্তান স্কুলে ভালো ফল করবে, যেন ভালো জায়গায় পড়াশুনা করতে পারে এবং সবশেষে একটা ভালো জায়গায় কাজ করে উপার্জন করতে পারে।

সব অভিভাবকই চান যেন অর্থনৈতিকভাবে তার সন্তান অন্তত তার চেয়ে কিছুটা হলেও ভালো অবস্থানে থাকে। বাংলাদেশের মতো একটা দেশে এই চাওয়াটা আশ্চর্য বিষয় নয়। যেটি আশ্চর্যের বিষয় সেটি হল, এই যে সিংহভাগ অভিভাবক চাচ্ছেন তাদের সন্তান বড় হয়ে একজন ভালো মানুষ হোক।

কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা সন্তানের স্কুল, পরীক্ষা, রেজাল্ট,

অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকার জন্য যতটা চিন্তা, যতটা সময়, পরিশ্রম আর অর্থ ব্যায় করি – তার অনেক কম চিন্তা করি বা কাজ করি সন্তানকে 'ভালো মানুষ' হিসাবে তৈরি করতে।

এরপর আমরা অভিভাবকদের জিজ্ঞেস করেছি, আপনারা বড় হয়ে কি চান সন্তানরা কি ধরণের কাজ করুক, কোন প্রফেশনে যাক?

বেশিরভাগ অভিভাবক বলেছেন, তাদের কোন নির্দিষ্ট চাওয়া নেই। সন্তানরা বড় হয়ে যে কাজেই ঢুকুক, তারা যেন ভালো করে, সফল হয়, সুখী হয়। আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন আমাদের মা-বাবার এই বিষয়ে শক্ত মতামত ছিল, সিদ্ধান্তও ছিল। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের জন্য সিদ্ধান্ত ছিল ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরি ইত্যাদি।

সময়ের সাথে সাথে এই চিন্তাধারার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি অভিভাবকদের মধ্যে। এখন বেশিরভাগ অভিভাবকরা সন্তানের জীবনের এই গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্তটিতে নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে চান না। এটা এই যুগের সচেতন অভিভাবকদের মধ্যে একটা ভালো পরিবর্তন।

অভিভাবকদের পর আমরা শিশুদের উপর জরিপ চালিয়েছি। তারা বড় হয়ে কি হতে চায়? তাদের স্বপ্ন কি? প্রায় ৫ হাজার শিশুর উপর এই জরিপটি চালানো হয়েছিল। এইসব শিশুদের বয়স ৪-১২ বছর বয়সের মধ্যে। ২ বছর ধরে এই জরিপটি চালানো হয়েছিল। শিশুদের উপর বাংলাদেশে করা এই বিষয়ে সবচেয়ে বড় জরিপ এটি।

কি বলেছে শিশুরা? তারা বড় হয়ে কি হতে চায়?
যে টপ ৫টি প্রফেশন তারা পছন্দ করেছে, যেগুলো তারা বড় হয়ে হতে চায় সেগুলো হচ্ছেঃ

১। ডাক্তার
২। শিক্ষক
৩। পুলিশ
৪। বিজ্ঞানী
৫। খেলোয়াড়

যদিও তালিকায় এক নম্বরের মধ্যে একটা গড়বড় আছে। অভিভাবকদের একটা ইনফ্লুয়েন্স আছে এই সিদ্ধান্তের মধ্যে। তারপরেও বলা যায় বাংলাদেশের শিশুরা মোটামুটি এগুলো হতে চায়। পাশাপাশি হালের কিছু ট্রেন্ড যেমন ইউটিউবার হওয়াও আমরা পেয়েছি শিশুদের থেকে।

এরকম কয়েক হাজার অভিভাবক ও শিশুদের সাথে আলাপ করার পর আমরা বুঝতে পারলাম যে অভিভাবকদের জন্য যদি আমরা এমন একটা গাইড তৈরি করতে পারি যেটি শিশুদের সাহায্য করবে তাদের স্বপ্ন পূরণে, ভবিষ্যতে তারা যেন সফল মানুষ হয়ে উঠে, তাহলে দারুণ একটা কাজের জিনিস হবে।

'ভালো মানুষ', 'সুখী মানুষ', 'সফল মানুষ' – এই শব্দগুলো আমরা বিভিন্ন সময় ব্যবহার করি। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝবেন, এগুলো কি আসলে ভিন্ন ভিন্ন জিনিস?

সফল, সুখী আর ভালো মানুষ তো আসলে একই হওয়া উচিত।
সমস্যা হচ্ছে আজকাল 'সফল মানুষের' সংজ্ঞা আমরা বদলে দিয়েছি। যার যত টাকা, যার যত ক্ষমতা – তাকেই এখনকার সমাজে আমরা 'সফল মানুষ' বলে আখ্যা দিচ্ছি। সে 'ভালো মানুষ' নাও হতে পারে। আবার খুব বড় ব্যবসায়ী, অঢেল টাকার মালিক, বিদেশে বাড়ি-গাড়ি করেছে – সে তো সফল, তাই না? কিন্তু তার যদি পরিবারের সাথে সম্পর্ক ভালো না থাকে, জীবনে সুখ না থাকে, সবসময় টেনশন থাকে – তাহলে আসলে তাকে কি 'সফল মানুষ' বলবো আমরা? এরকম জীবন কি আমরা চাই আমাদের সন্তানের জন্য?

আমাদের সন্তানের কারণে যদি অন্য মানুষের ক্ষতি হয়, তাহলে তাকে কিভাবে আমরা সফল বলতে পারি? তার দূর্নীতির কারণে যদি দেশের স্বার্থ নষ্ট হয় তাহলে আমরা কি তাকে সফল মানুষ বলবো। অভিভাবক হিসাবে সময় এসেছে, আমাদের সন্তানদের জন্য সফলতার সংজ্ঞা ঠিক করা।

আমার সন্তানকে একই সাথে 'ভালো মানুষ' 'সফল মানুষ' আর 'সুখী

মানুষ' হিসাবে কিভাবে গড়ে তুলবো? এতো ভারি কঠিন কাজ বলে মনে হচ্ছে। কথা সত্যি। এই ৩টা জিনিস একই সাথে সন্তানের মধ্যে দিতে পারাটা আসলেই কঠিন কাজ। আমাদের জন্য আরও কঠিন কাজ ছিল পুরো ব্যাপারটাকে সহজ ভাষায় অভিভাবকদের কাছে উপস্থাপন করা। এবং এমন কিছু গাইডলাইন দেয়া যেগুলো মেনে চললে এই কাজটা সহজ হতে পারে।

গত ৪ বছর ধরে আমরা এই বইটি লেখার জন্য কাজ করছি। এবং যত গবেষণা পড়েছি, যত এক্সপার্টদের সাথে কথা বলেছি এবং অভিভাবকদের সাথে কথা বলেছি ততই আমাদের কাছে একটা ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি হয়েছে। এমন একটা ফ্রেমওয়ার্ক যার মাধ্যমে ধাপে ধাপে এই কাজটি করা সম্ভব হবে।

এই বইয়ে আমরা সেই ভালো মানুষ আর সফল মানুষ তৈরির ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে আলোচনা করেছি। বিভিন্ন রিসার্চ থেকে রেফারেন্স নিয়েছি, বিভিন্ন স্ট্রেটেজি শেয়ার করেছি – যাতে করে আপনি আপনার সন্তানকে সাহায্য করতে পারবেন যেন সে একজন 'ভালো মানুষ' 'সুখী মানুষ' এবং 'সফল মানুষ' হিসাবে গড়ে উঠে।

সব মিলিয়ে অভিভাবকদের জন্য এমন একটা গাইড তৈরি করার চেষ্টা করেছি যেটা ব্যবহার করে তারা নিজের সন্তানদের 'ভালো মানুষ' আর 'সফল মানুষ' – দুটো হিসাবেই গড়ে তুলতে পারেন।

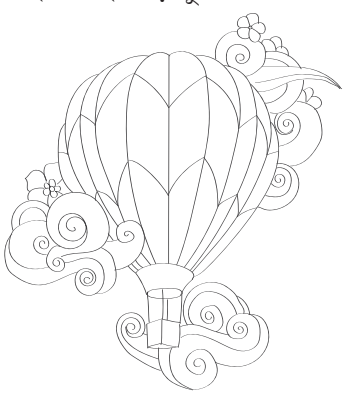

সূচিপত্র

অধ্যায়- ১ শিশুকে আত্মবিশ্বাসী ও সফল করে তোলার ধাপ ১

অধ্যায়- ২ সন্তানের স্বপ্ন পূরণে পরিকল্পনা ..... ৪ - ১৩

অধ্যায়- ৩ শিশুর আত্মবিশ্বাস ও নিজের প্রতি গর্ব ..... ৪ - ১৩

- শিশুকে আত্মবিশ্বাস শেখানো কেন এতো গুরুত্বপুর্ণ
- সন্তানের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব যাচাই করবেন কিভাবে?
- আত্মবিশ্বাসী সন্তান গড়ার উপায়

অধ্যায়- ৪ শিশুর আত্মনিয়ন্ত্রণ ..... ৪ - ১৩

- শিশুকে আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখানো কেন এতো জরুরি?
- Teaching Need vs Want: দরকার আর চাওয়া কিভাবে শিখাবেন?
- আত্মনিয়ন্ত্রণ কিভাবে শেখাবেন আপনার শিশুকে?

অধ্যায়- ৫ সন্তানের ফাইনান্সিয়াল লিটারেসি ..... ৪ - ১৩

- টাকা পয়সার সাথে শিশুর পরিচয়
- সঞ্চয় করতে শেখা

অধ্যায়- ৬ শিশুর শেয়ারিং শেখা ..... ৪ - ১৩

অধ্যায়- ৭ সন্তানকে সুখী ও সফল মানুষ হিসাবে গড়ুনঃ গবেষণার আলোকে ২৫ টিপস ..... ৪ - ১৩

অধ্যায় ১

আত্মবিশ্বাসী ও সফল সন্তান গড়ে তুলবেন যেভাবে?

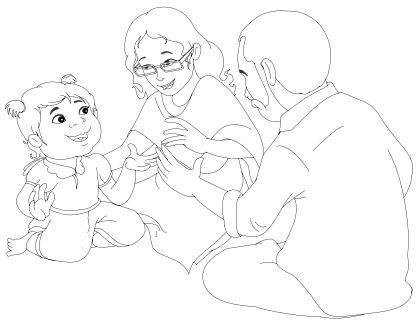

প্রথমেই আমরা বইয়ের পুরো সংক্ষিপ্ত একটা সামারি তুলে ধরছি এই চ্যাপ্টারে।

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমরা যা হতে চাইতাম, বড় হয়ে কি সেটা আর হতে পেরেছি?

একটা শিশুকে তার স্বপ্নকে সত্যি হতে সাহায্য করলে তার নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস বাড়ে। একটা আত্মবিশ্বাসী শিশু জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভালো করে। প্রথমে সে একাডেমিক্যালি ভালো করে, তারপর প্রফেসনাল লাইফে, এবং পরবর্তীতে তার ব্যক্তিগত জীবনে।

নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসী মানুষের সফল ও সুখী হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

পুরো বইয়ে মোট ৬টি ধাপে শিশুকে কিভাবে আত্মবিশ্বাসী ও সফল মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে পারেন, সেটা নিয়ে খুব সহজ ভাষায়, ধাপে ধাপে দেখানো হয়েছে।

যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা হয়েছে। আমরা সেই খটমটে গবেষণাপত্র দিয়ে আপনাদের পড়ার ন্যাচারাল ফ্লো নষ্ট করতে চাইনি। তারপরেও বইয়ের বেশ কিছু

চাপ্টারে কিছু গবেষণার রেফারেন্সের সুত্র ধরে কথা বলেছি। চলুন তাহলে সংক্ষেপে জেনে নেই ৫টি ধাপ সম্পর্কে।

সফল ও সুখী হওয়ার ধাপ

প্রথম ধাপঃ

১) শিশু নিজের স্বপ্ন চিহ্নিত করতে পারবেঃ

প্রতিটি শিশুর নিজের কিছু স্বপ্ন থাকে। সেটি অনেক ছোট থেকে অনেক বড়ও হতে পারে। আবার স্বপ্নগুলো আগামী ২ মাসে বাস্তবায়ন করা যাবে এমন থেকে শুরু করে আরও ২০ বছর পরেরও হতে পারে। প্রথম ধাপের প্রথম কাজ হচ্ছে আপনি শিশুকে কিভাবে সাহায্য করবেন সে যেন তার স্বপ্নগুলো বা লক্ষ্যগুলো চিহ্নিত করতে পারে। কেউ হয়তো বলবে আমি লাল বলটি কিনতে চাই। আবার কেউ হয়তো বলবে আমার স্বপ্ন হল বড় হয়ে আমি ক্রিকেটার হতে চাই।

আপনার শিশুর লক্ষ্য বা স্বপ্নগুলো যাই হোক না কেন, অভিভাবক হিসাবে আপনার দায়িত্ব হচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে জানা।

২) নিজেদের স্বপ্ন পূরণের জন্য পরিকল্পনা করতে পারবেঃ

আপনি যখন আপনার শিশুর লক্ষ্য বা স্বপ্নগুলো সম্পর্কে জেনে যাবেন এরপর আপনার কাজ হল আপনার সন্তানের স্বপ্ন পূরণে আপনি তাকে কিভাবে পরিকল্পনা করতে সাহায্য করতে পারেন।

খেয়াল করুন, আমরা কিন্তু বলেছি 'তার স্বপ্ন/লক্ষ্য পূরণে তাকে পরিকল্পনা করতে সাহায্য করার' কথা। তাকে সবকিছুই আপনি করে দিবেন বা বলে দিবেন এমন নয় কিন্তু।

শিশুর স্বপ্ন পূরণে কিভাবে আপনি তাকে পরিকল্পনা করতে সাহায্য করতে পারেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত আছে মূল চ্যাপ্টারে।

দ্বিতীয় ধাপঃ

১) নিজেকে এবং অন্যকে সম্মান করবেঃ

প্রথম ধাপের কাজগুলো করার সময়কালীনও আপনি দ্বিতীয় ধাপের কাজ শুরু করে দিতে পারেন। এখানে দুটি বিষয়ের উপর জোর দেয়া হচ্ছে। একটি হল শিশু যেন তার নিজের সম্পর্কে একটি ভালো ধারণা থাকে। সে যেন নিজেকে নিয়ে গর্ববোধ করে। তার মধ্যে যেন আত্মবিশ্বাস থাকে।

ছোট শিশুরা প্রায়ই মন খারাপ করে যখন দেখে অন্য কেউ কিছু একটা পারে, কিন্তু সে ওটা পারে না। অনেক সময় অভিভাবকদের আচরণও খারাপ প্রভাব ফেলে। অনেকেই শিশুদের বলেন যে অমুক তো পরীক্ষায় এত ভালো করলো, আর তুমি তো পারলে না।

এত ছোট বয়সেই যখন শিশুকে অন্য আরেকটি শিশুর সাথে তুলনা শুরু করে দেয়া হয় এতে করে তার আত্মবিশ্বাস এবং নিজের প্রতি সম্মান অনেক কমে যায়। শিশুকে বরং এটি বুঝান যে তুমি এমন কিছু পারো যা

অন্যরা হয়তো পারে না। তার জন্য তোমার গর্ব করা উচিত।
এবং নিজেকে সম্মান করার পাশাপাশি অন্য শিশুদেরকেও যেন সে সম্মান করে সেটির দিকে অভিভাবকদের নজর রাখতে হবে।

২) নিজের কাছে যা আছে বা নিজে যা পারে সেটি নিয়ে গর্ব করবে এবং তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা শিখবেঃ

এটি আগেরটার সাথে সম্পর্কিত। শিশু নিজে যা পারে অথবা তার নিজের যা আছে সেটি নিয়ে তার মধ্যে সন্তুষ্টি এবং গর্ব থাকে।

অনেক সময় দেখা যায় কোন একটা শিশু স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে বাবা-মাকে বলছে যে অমুকের কত সুন্দর একটা ব্যাগ আছে, কিন্তু আমার তো নেই। এইসব সময়ে অভিভাবকের তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে তোমার তো অমুক অমুক জিনিসটি আছে, সেটি তো আবার তোমার বন্ধুর কাছে নেই। এই কাজটি না করে আপনি যদি তখনই আরেকটা ব্যাগ তাকে কিনে দেন, তখন পরের দিন দেখবেন অন্য কারোর কাছে সে নতুন কিছু একটা দেখে সেটার বায়না ধরবে। এভাবে কোনদিনই তার চাহিদা মিটবে না এবং তার নিজের মধ্যে তার যা আছে সেটি নিয়ে সন্তুষ্টি আসবে না। এতে করে আপনার শিশুর মধ্যে বড় হওয়ার পরও এই সমস্যা থেকে যাবে।

তৃতীয় ধাপঃ

১) শিশুরা 'দরকার' এবং 'চাওয়ার' পার্থক্য বুঝবেঃ

কোন কিছু কেনাকাটা করতে গিয়েছেন, সাথে আপনার শিশু। কখনও খেলনা, কখনও চকলেট বা আইসক্রিম, কখনও বা নতুন জামার বায়না – একটা কিছু থাকবেই আপনার শিশুর। এমন অভিজ্ঞতা সব অভিভাবকদেরই আছে। সবসময় আমাদের কাছে শিশুর নতুন নতুন সব বায়না বা চাওয়া পূরণ করা সম্ভব হয় না আমাদের জন্য।

নিজেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ (self-control) করার প্রথম ধাপ হল কোনটি শিশুর 'দরকার' এবং কোনটি তার 'চাওয়া' সেটির পার্থক্য বুঝতে পারা । আত্মনিয়ন্ত্রণ (self-control) শেখানো কেন এত গুরুত্বপূর্ণ সেটি পরবর্তী চ্যাপ্টারে জানতে পারবেন।

২) শিশু আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে শিখবেঃ

এই ধাপে মূলত শিশুর আত্মনিয়ন্ত্রণ (self-control) নিয়ে কাজ করতে হবে। কোন কিছু পাওয়ার জন্য যে অপেক্ষা করতে হয় সে ব্যাপারটি শিশুকে শেখাতে হবে। সেটি তার প্রিয় খাবার থেকে শুরু করে কোন নতুন খেলনা পাওয়া – যে কোনো কিছুই হতে পারে।

চতুর্থ ধাপঃ

১) টাকা এবং অন্যান্য সম্পদের মূল্য সম্পর্কে জানবেঃ

টাকা নিয়ে শিশুদের সাথে কথা বলতে চান না অনেক অভিভাবক। এটি একটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। শিশুদের অল্প বয়স থেকেই টাকা কিভাবে উপার্জন হয়, টাকার মূল্য ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। টাকা যে উপার্জন করতে হয় এবং টাকা যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকে সেই ধারণা শিশুর মধ্যে তৈরি না হলে সে বুঝতেই পারবে না তার জন্য কেন কোন জিনিস চাওয়া মাত্র কিনে দেয়া হয় না।

টাকার পাশাপাশি অন্যান্য সম্পদ যেমন পানি, ইলেক্ট্রিসিটি ইত্যাদি সম্পর্কেও ধারণা দিতে হবে। পানি বা ইলেক্ট্রিসিটি বাঁচানোর মাধ্যমেও যে সঞ্চয় করা যায় সে সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। এর বাইরে বিভিন্ন সম্পদের যে একটি মূল্য আছে সে সম্পর্কেও অবহিত করতে হবে।

২) সম্পদ সঞ্চয়ে এবং পুনরায় ব্যবহারে উৎসাহী হবেঃ

আগেই একবার বলা হয়েছে শিশুকে কিভাবে সম্পদ সঞ্চয়ে উৎসাহ দিতে হবে। টাকা শিশু নানাভাবে পায় – জন্মদিন বা ঈদের সালামি। শিশু নিজে কিভাবে টাকা সঞ্চয় করতে পারে এবং সেই সঞ্চিত টাকা দিয়ে তার লক্ষ্য পূরণে (নতুন খেলনা বা পছন্দের ব্যাগ কেনা) ব্যয় করতে পারে সে সম্পর্কে জানাতে হবে।

পুরাতন জিনিস নতুন করে ব্যবহার করার মাধ্যমে শিশু যে কেবল খরচ বাঁচানো শিখবে তা নয়, এতে করে তার মধ্যে অপচয় করার প্রবণতাও কমবে। Recycle, Reuse করার মাধ্যমে শিশুরা অনেক শিক্ষা পায় যেগুলো তার সৃজনশীলতা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা তৈরিতেও সাহায্য করে।

ক্র্যাফটের কাজ করার মাধ্যমে অনেক সময় Recycle শেখানো যায় শিশুদের।

পঞ্চম ধাপঃ

১) শিশু অন্যর সাথে ভাগাভাগি করা শিখবেঃ

শিশুদের যে কেবল সঞ্চয়, টাকা জমানো এবং সঠিকভাবে খরচ করার ধারণা দিবেন এমন নয়। এটার পাশাপাশি শিশুকে উৎসাহ দিন তার কোন জিনিস অন্যর সাথে ভাগাভাগি করার জন্য। শিশুরা প্রায়ই নিজের খেলনা অন্য কারোর সাথে শেয়ার করতে চায় না, এমনকি নিজের ছোটবড় ভাইবোনের সাথেও।

ছোটবেলার থেকেই শেয়ার করা বা অন্যর সাথে ভাগাভাগি করার জন্য উৎসাহ দিন। তাকে বুঝান যে আমরা একজন অন্য আরেকজনের সাথে ভাগাভাগি করলেই বরং মজা আরও বেশি হয়। এবং অনেক সময় আমরা যদি ভাগাভাগি না করি তাহলে সবাই সবকিছুর আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে।

শিশুকে অল্প বয়স থেকেই দান করতে উৎসাহ দিন। তার পুরাতন খেলনা বা বই অন্য কাউকে যার 'দরকার' তাকে দান করতে বলুন। শিশুকে নিয়ে আজকেই বাছাই করে ফেলুন তার ব্যবহার উপযোগী পুরাতন খেলনা বা কাপড় কি আছে যেটি দান করা যাবে।

উপরে উল্লেখ করা এই ধাপগুলো মেনে চলে আজকে থেকেই আপনার শিশুর সাথে কাজ শুরু করুন। আস্তে আস্তে আপনি আপনার শিশুর মধ্যে এমন সব পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন যে আপনার শিশুকে নিয়ে আপনার রীতিমত গর্ব হবে।

আপাতদৃষ্টিতে কাজগুলো খুব সহজ কিংবা স্বাভাবিক মনে হতে পারে। আপনারা অনেকেই হয়তো এর মধ্যে কিছু জিনিস ইতিমধ্যে সন্তানদের সাথে করছেন। তার জন্য অভিনন্দন। সেগুলো চালু রাখুন। পাশাপাশি নতুন যেসব ধাপ নিয়ে কথা হয়েছে, সেগুলো আপনি আজকে থেকেই সন্তানের সাথে শুরু করুন।

চলুন তবে আমরা বইয়ের পরবর্তী অংশে যাই যেখানে আমরা সবগুলো ধাপ নিয়ে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।

অধ্যায় ২

সন্তানের স্বপ্ন পূরণে পরিকল্পনা

প্রতিটি শিশুর অনেক অনেক স্বপ্ন থাকে। বড় হয়ে কেউ হতে চায় স্পাইডারম্যান, কেউ হতে চায় ডাক্তার, কেউবা এলিয়েনের শিপের ড্রাইভার। শিশুর স্বপ্নগুলো আপনার কাছে যতই আজব মনে হোক না কেন, তার কাছে কিন্তু তার মূল্য অনেক। এই চ্যাপ্টারে আমরা আলোচনা করেছি কিভাবে অভিভাবক হিসাবে আপনি আপনার সন্তানদের স্বপ্ন পূরণে সাহায্য করতে পারেন।

আমরা একবার একটি ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা করেছিলাম। বিষয় ছিল – 'আমি বড় হয়ে যা হতে চাই।' সেখানে আমরা শিশুদের অনেক মজার সব স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষার সাথে পরিচিত হয়েছি। অনেকেই ডাক্তার, বিজ্ঞানী, বা শিক্ষক হতে চেয়েছে। কিন্তু আবার কেউ হতে চেয়েছে বাস ড্রাইভার, কিংবা স্পেসশিপের পাইলট।

কিন্তু আপনি যদি মনে করেন কেন আপনার শিশু বাস ড্রাইভার হতে চাবে? সে হবে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার। তাহলে আপনি ভুলভাবে চিন্তা করছেন। উল্টা ভাবুন এবং তাকে পরিকল্পনা করতে বলুন এবং তাকে

সাহায্য করুন কিভাবে সে বাস ড্রাইভার হওয়ার পরিকল্পনা করতে পারে। আপনিও জানেন সে যখন বড় হবে তখন নিশ্চয়ই বাস ড্রাইভার হতে চাবে না। কিন্তু শিশুকালেই যদি তার স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষাকে চাপা দিয়ে দেন তাহলে সে বড় হয়ে আসলে যা হতে চাইবে তার পরিকল্পনা করতে পারবে না। তাই শিশুর স্বপ্ন এখন আপনার কাছে যতই অবাস্তব মনে হোক না কেন তাকে অনুৎসাহিত করবেন না। বরং তাকে উৎসাহ দিন এবং তাকে তার স্বপ্ন বাস্তবায়নে 'পরিকল্পনা' করতে সাহায্য করুন।

আমাদের এখানে রায়হান নামের এক ৫ বছরের শিশু একবার বলল সে বড় হয়ে এলিয়েনদের প্লেনের ড্রাইভার হতে চায়। তখন তাকে আমরা বললাম, 'আচ্ছা তুমি কি জানো এলিয়েনের প্লেনের ড্রাইভার হতে চাইলে কি করতে হবে। এলিয়েনদের সাথে দেখা করার জন্য তোমাকে মহাকাশে যেতে হবে। চাঁদ, সূর্য ছাড়িয়ে আরও অনেক দূরে। সেখানে যেতে হয় স্পেসশিপ নিয়ে। তার জন্য তো তোমাকে প্রথমে স্পেসশিপ চালানো শিখতে হবে। বিজ্ঞান নিয়ে জানতে হবে। আরও অনেক পড়াশুনা করতে হবে।'

সে বলল, 'তাই? এখন থেকে তাহলে আমি বিজ্ঞানের বই পড়বো।'

তারপর তাকে বললাম, স্পেসশিপে চড়তে হলে স্পেসস্যুট পড়তে হয়। এমন অনেক কাজ করতে হয় যার জন্য তোমার স্বাস্থ্য ভালো হতে হবে। আর তার জন্য তোমাকে ভালোমত এবং নিয়মিত খাবার খেতে হবে। বিশেষ করে শাকসবজি খেতে হবে। আর নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে।

'আমার তো সবজি মোটেই ভালো লাগে না।'

'কিন্তু তুমি তো এলিয়েনদের কাছে যেতে চাও। তাদের প্লেন চালাতে তোমার খালি বুদ্ধি আর পড়াশুনা জানলেই হবে না, তোমার স্বাস্থ্যও ভালো হতে হবে।'

'আচ্ছা, তাহলে এখন থেকে আমি আম্মুকে বলবো আমাকে প্রতিদিন

একটু করে সবজি দিতে। এখনই বেশি দিলে আমি খেতে পারবো না তো । তাই কম কম দিয়ে শুরু করি?'

'আচ্ছা, কোন সমস্যা নেই।'

এই পর্যায়ে আমরা তাকে ইউটিউব থেকে কিছু ভিডিও দেখালাম যেখানে একজন মহাকাশচারী হতে হলে কি করতে হবে, কি ধরণের কাজ হয় সেগুলো দেখানো হয়েছে শিশুদের উপযোগী করে।

এই পর্যায়ে এসে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা তাহলে যদি তুমি এলিয়েনদের প্লেনের ড্রাইভার হতে চাও তোমাকে কি কি করতে হবে? চল তো একটা পরিকল্পনা করি। পরিকল্পনা মানে কি জানো?'

কোন একটা কাজ ধাপে ধাপে করার নামই হচ্ছে পরিকল্পনা।

এরপর রায়হানের পরিকল্পনা ছকটি যেরকম দাঁড়ালো সেটি হলঃ

লক্ষ্যঃ এলিয়েনদের প্লেনের ড্রাইভার হওয়া

পরিকল্পনার ধাপঃ

১। অনেক বিজ্ঞানের বই পড়তে হবে।

২। নিয়মিত সবজি খেতে হবে।

৩। ব্যায়াম করতে হবে।

৪। স্পেসশিপ চালানো শিখতে হবে।

৫। চাঁদে যেয়ে এলিয়েনদের ফোন করতে হবে।

(৫ নাম্বারটি শুনে আমরা হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেয়েছি প্রায়)

এরপর তার এই পরিকল্পনাটি আমরা লিখে তাকে তার রুমের দেয়ালে বা পড়ার টেবিলের সামনে লাগিয়ে দিতে বললাম। এখন থেকে প্রতিদিন যেন সে তার এই পরিকল্পনাটি দেখতে পারে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে।

আপনি কি আপনার শিশুকে কখনও জিজ্ঞেস করেছেন সে বড় হয়ে কি হতে চায়? না করে থাকলে এখনই করে ফেলুন। এরপর আমাদের উপরের উদারহনের মত করে তার সাথে একটি পরিকল্পনা করে ফেলুন । দুজন মিলে সেটি লিখে ফেলুন। আকর্ষণীয় করার জন্য ভবিষ্যতের তার একটা ছবি এঁকে সেটিকে রঙ করে ফেলতে বলুন। এবার ছবি আর পরিকল্পনার ধাপগুলো তাকে বলুন তার রুমের দেয়ালে বা পড়ার টেবিলের সামনে লাগিয়ে ফেলতে।

এরপর থেকে আপনার কাজ হল মাঝে মাঝে তাকে মনে করিয়ে দেয়া সে তার পরিকল্পনামত সব কাজ নিয়মিত করছে কিনা। আমরা জানি অভিভাবকদের অনেক বড় দুইটি অভিযোগ তাদের শিশুদের নিয়ে এই যে সন্তান পড়াশুনা করতে চায় না আর ঠিকমতো খেতে চায় না। সে বড় হয়ে যাই হতে চাক না কেন এই দুইটি বিষয় কিন্তু তার মেনে চলতেই হবে। সে নিজেই যদি তার পরিকল্পনার মধ্যে এগুলো আনে তাহলে তো তাকে দিয়েই আপনি এই দুইটি কাজ করিয়ে নিতে পারবেন। আপনার ঝামেলাও গেল কমে।

আরেকটা ব্যাপার খেয়াল রাখবেন যে আপনার শিশুর কিন্তু একের অধিক স্বপ্ন থাকতে পারে। সেগুলোও এরকম করে আস্তে আস্তে একের পর এক করে ফেলুন। আবার আরেকটা ব্যাপার দেখবেন, যে শিশু কিছুদিন আগেই ডাক্তার হতে চেয়েছিল, কিছুদিন পরেই হয়তো সে শিক্ষক বা বিজ্ঞানী হতে চাইবে। শিশুদের ক্ষেত্রে এটিই স্বাভাবিক। তার স্বপ্ন পরিবর্তন হলে সেই অনুযায়ী আপনিও তাকে তার নতুন ‘পরিকল্পনা ছক’ তৈরি করে দিন।

এই কাজগুলো যদি আপনি আপনার ৩-৮ বছর বয়সী শিশুর সাথে

কয়েকবার করেন তাহলে দেখবেন কিছুদিনের মধ্যেই তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। সে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হবে, নিজের পরিকল্পনা নিজে করতে পারছে, এবং অনেক বেশি স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে । অভিভাবক হিসাবে সেটি আমাদের সবার চাওয়া।

শিশুর স্বপ্নকে উৎসাহ দিন আর তাকে পরিকল্পনা করতে সাহায্য করুন।

বিশেষ নোটঃ অবশ্যই যেগুলো করা যাবে না
সন্তানকে নিয়ে আপনার নিজস্ব পরিকল্পনা থাকতে পারে। কিন্তু এখনই সেটা চাপিয়ে দিতে যাবেন না। সেটা যদি আপনার সাথে না মিলে এতে করে হিতে বিপরীত হতে পারে।

এই কাজটির করার উদ্দেশ্য এটা না যে তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে ফেলা। আজ যেটা সে হতে চাইছে, সেটা নিয়ে সে পরিকল্পনা করতে পারছে কিনা সেটাই গুরুত্বপুর্ণ। কারণ সে যখন বড় হবে, তখন সে যেন তার চাওয়া পূরণ করার জন্য সঠিক পরিকল্পনা করতে পারে।

পাশাপাশি আপনি যখন সন্তানের ইচ্ছা, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা এগুলো সম্পর্কে ধারণা পাবেন, তখন সেই অনুযায়ী তার সাথে কাজ করতে পারবেন। তার সাথে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন। এমনকি স্মার্টফোনে সে কি দেখতে আগ্রহী হবে সেটাও গাইড করতে পারবেন। যেমনটা আমরা করেছিলাম রায়হান নামের সেই ৫ বছরের ছেলেটির সাথে।

সন্তানের সাথে একটিভিটি
১। সন্তানের স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষা খুঁজে বের করা
- সন্তানের ছোট ইচ্ছেগুলো কি ও কেমন? অভিভাবক হিসাবে আমরা কি সেগুলো জানি?
- সেটা খুঁজে বের করার উপায় কি?

শিশুর বয়স যাই হোক না কেন, আপনি প্রশ্ন করেই সেটা জেনে নিতে

পারেন। আর তারপর তাকে ‘ইচ্ছে গাছ’ নামের একটা গাছ আঁকতে বলতে পারেন। সেখানে তার নিজের ইচ্ছেগুলো লিখতে পারে।

নিচের ছবিতে এমন একটা গাছ দেখানো হল। শিক্ষকরা এটা ক্লাসেও করতে পারেন আপনার স শিক্ষার্থীদের সাথে। এক একটা পাতায় এক একজন শিশু লিখলো সে বড় হয়ে কি হতে চায়। এরপর সেটা ক্লাসরুমে ঝুলিয়ে দিলেন।

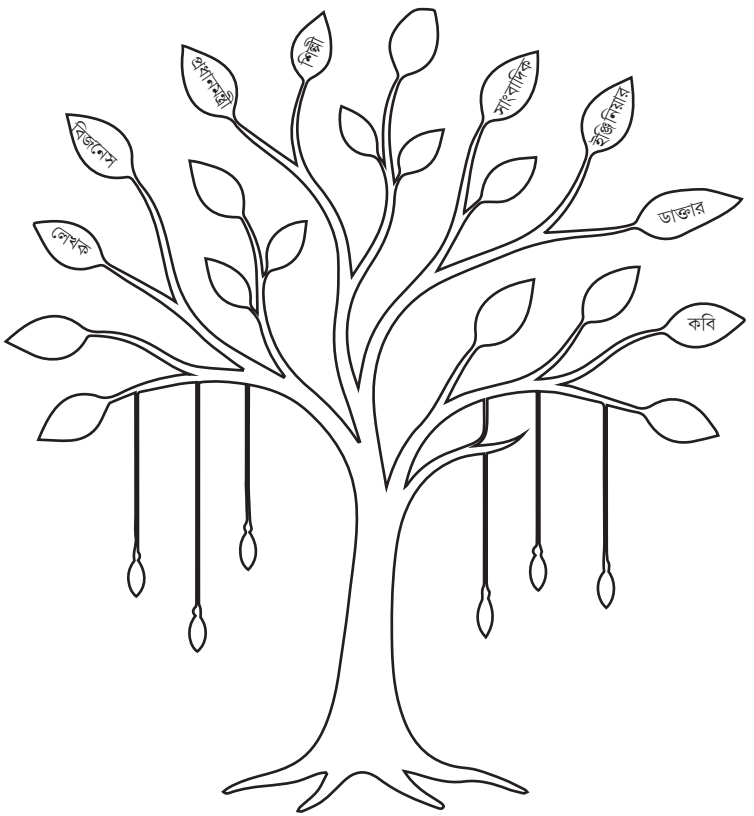

তোমার ইচ্ছেগুলো গাছের পাতায় লিখ।

২। সন্তানের ইচ্ছে পূরণের জন্য পরিকল্পনা তৈরিতে সাহায্য করা
পরিকল্পনা কি? পরিকল্পনা হচ্ছে কোন কাজ ধাপে ধাপে করা।
সন্তানের পরিকল্পনাঃ

- একটা শিশু কোন কাজের জন্য নিজে নিজে পরিকল্পনা করতে পারে। অভিভাবক হিসাবে দায়িত্ব হচ্ছে তার সেই পরিকল্পনা ঠিকমতো করার জন্য সাহায্য করা
- শিশুর ইচ্ছেগাছ পূরণ করার মাধ্যমে বুঝতে চেষ্টা করুন তার আসলে কি কি ইচ্ছে? তার ইচ্ছে যাই হোক না কেন সেগুলোর ভেতরে 'মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করা' 'স্বাস্থ্যর দিকে খেয়াল রাখা' এগুলো পরিকল্পনার ধাপের মধ্যে রেখে দেয়ার চেষ্টা করুন। যেমন কেউ যদি বলে আমি বিজ্ঞানী হতে চাই, তাহলে তাকে বলুন বিজ্ঞানী হতে চাইলে তোমাকে মনোযোগ দিয়ে বিজ্ঞান, গণিত এই বিষয়গুলো ভালো জানতে হবে।

তার পরিকল্পনাটা সঠিকভাবে করার জন্য নিচের ছকটি ব্যাবহার করতে পারেন।

আমার ইচ্ছেঃ ডাক্তার হতে চাই

পরিকল্পনার ধাপ	**পরিকল্পনার বাস্তবায়নে**
১।	. .
২।	. .
৩।	. .
	. .
	. .
	. .

ইচ্ছে পূরনে আমার প্রতিদিনের কাজের রুটিনঃ

কাজ	শুক্রবার	শনিবার	রবিবার	সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার

অধ্যায় ৩

শিশুর আত্মবিশ্বাস ও নিজের প্রতি গর্ব

সন্তানের আত্মবিশ্বাস, সম্মান ও গর্ব
১। নিজেকে এবং অন্যকে সম্মান করবে।
২। নিজেকে নিয়ে গর্ব করবে এবং যা আছে সেটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে।

সন্তানের আত্মবিশ্বাসের অভাবঃ কিভাবে বুঝবেন? কিভাবে সমাধান করবেন?

যদি কোন শিশুর মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা যায়, সেটার শুরুটা হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিবার থেকে। এরপর স্কুলে গিয়ে সেটা আরও প্রকট আকার ধারণ করে।

একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। কেবল আত্মবিশ্বাসের জোরে সব বাধা ঝেড়ে ফেলে ইতিহাসের পাতায় নাম লেখিয়েছেন এমন উদাহরণ ভুরিভুরি। অপরদিকে নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসের অভাবের কারণে একজন নিজের জীবনের জন্য বড় গোল সেট করতে পারে না। আত্মবিশ্বাসের অভাবে আমাদের ক্যারিয়ার, আমাদের সম্পর্ক - এসব কিছুর উপরেই নেগেটিভ প্রভাব পরে। আর এই আত্মবিশ্বাসের বীজটি বপন হয় শিশুকালেই এবং অভিভাবকদেরই এতে থাকে সবচেয়ে বড় ভূমিকা।

আপনার শিশুর মধ্যে যদি নিচের ৫ টি লক্ষণ দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দিয়েছে।

১। নতুন কোন কাজ বা চ্যালেঞ্জ নিতে না চাওয়া
আপনার শিশু কি নতুন কোন কাজ করতে বা নতুন কোন জায়গায় যাওয়ার ব্যাপারে অনীহা আছে? নতুন অপরিচিত জায়গায় না যাওয়ার জন্য বাহানা তৈরি করে, নতুন কোন কাজ করতে দিলে প্রচণ্ড নার্ভাস হয়ে যায়? অনেক সময় কোন চ্যালেঞ্জ নেয়ার আগে শিশুর ক্ষেত্রে নার্ভাস থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন যে সে কি আসলে নার্ভাস নাকি ভয় পাচ্ছে। যেমন নতুন নতুন সাঁতার কাটা শেখার সময় শিশুরা নার্ভাস থাকতেই পারে। কিন্তু প্রচণ্ড ভয়ের কারণে যদি পানির কাছেই যেতে না চায় তাহলে হয়তো আপনার শিশুর মধ্যে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি কিছুটা আছে।

এক্ষেত্রে আপনার করণীয়ঃ
সহানভুতির প্রকাশ দেখান আপনার আচরণেঃ

শিশু তার নিজের পরিচিত কমফোর্ট জোন থেকে বাইরে বের হয়ে কোন কিছু করতে যাওয়ার সময় তার এটা বুঝা দরকার যে যাই হোক না কেন আপনি সবসময় তার সাথে আছেন। তার কোন মন্তব্য বা তার কোন কথা সেটা আপনার কাছে যতই ছোট বা অপ্রাসঙ্গিক লাগুক না কেন আপনার

খুব মনোযোগের সাথে শুনতে হবে। আপনার কাছে ব্যাপারটি কিছুই মনে না হতে পারে, কিন্তু তার জন্য সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ছোট ছোট ধাপে আগানঃ

প্রথম সাঁতার শেখানোর জন্য শিশুকে নিয়ে গেছেন। প্রথম দিন যদি সে পানিতে নামতে না চায় তাহলে জোর করবেন না। প্রথম দিন দরকার হলে সে পানির কাছে বসে থাকুক, অন্যরা সাঁতার কাটছে বা কাটার চেষ্টা করছে সেটা দেখুক। চাইলে দেখুন তাকে দিয়ে পানিতে পা ভেজানোর বা পুলের কাছে বসে পা ডুবিয়ে বসতে উৎসাহ দিন। পরের দিন আবার ফিরে আসুন আবার পানির কাছে।

আমার মনে আছে আমাকে ছোটবেলায় সাঁতার শেখানোর জন্য আমার চাচা আমাকে পুকুরের মাঝে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। প্রথমে অভয় দিয়েছে যে আমাকে একা ছাড়বে না। কিন্তু কথা রাখেনি। ঠিকই পুকুরের মাঝে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে দেয়। আমি ভয় পেয়ে হাত-পা ছুঁড়ে পানি খেতে খেতে কোনোমতে পাড়ে আসি। একসময় মনে হচ্ছিল আমি ডুবে যাবো, এবং আমার চাচা আমাকে আসলে খুঁজে পাবে না আমি কোথায় ডুবে গেছি।

এক সময় শরীরের সব শক্তি শেষ হয়ে এলো। আমি ক্লান্ত হয়ে হাত-পা ছেড়ে দিয়েছি তলিয়ে যাওয়ার জন্য, তখনই আমার পা মাটির স্পর্শ পায় । পিছন থেকে আমার চাচা এসে হাসিমুখে বলল, দেখসিস বলেছিলাম না পারবি।

এই ট্রমার পর আমি পরের ২-৩ বছর চেষ্টাই করিনি সাঁতার শেখার। পুকুরে অল্প পানিতে নেমে ডুব দিয়ে উঠে আসতাম। আমি এখনও সাঁতার পারি না।

তাই শিশুকে নতুন কিছু একটা শিখাতে চাইলে, সে যদি প্রথমে ভয় পায়, কিংবা না করতে চায়, তাহলে জোর করবেন না। ছোট ছোট ধাপে, একটু

একটু করে পুরো কাজটা শেখান।

২। নিজের সম্পর্কে নেগেটিভ কথা বলা

যদি আপনার শিশু নিজের সম্পর্কে নেগেটিভ বলে, তাহলে ধরে নিবেন মনে মনে সে নিজেকে আরও ছোট ভাবছে। সে যদি বলে তাকে দিয়ে এটা হবে না, সে এটা পারবে না, সে দেখতে ভালো না, সে অন্যদের মত স্মার্ট না... তাহলে বুঝবেন ঐ ব্যাপারে তার নিজের উপর কনফিডেন্স নেই। বিশেষ করে তার নিজের দৈহিক গঠন (লম্বা-খাটো, মোটা-পাতলা ইত্যাদি) বা চেহারা নিয়ে যদি কোন হীনমন্যতা থাকে তাহলে সেটা তার অন্য কাজেও এফেক্ট করে। এরকম ক্ষেত্রে অবশ্যই সেটি নজর দিতে হবে অভিভাবকদের।

এক্ষেত্রে আপনার করণীয়ঃ

তার কথা সিরিয়াসলি নিন প্লিজ। দয়া করে এমন বলবেন না, আরে ধুর... তুমি তো গণিতে/বিজ্ঞানে/ছবি আঁকায়/দেখতে/বুদ্ধিতে ভালো।

এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি তাকে জিজ্ঞেস করেন সে কেন মনে করছে সে বিজ্ঞানে/দেখতে/বুদ্ধিতে ভালো না। সে কি ভাবছে সেটা জানার চেষ্টা করুন।
আপনি নিজে কি কখনও কোন কথায় বলেন যে আপনি এটাতে ভালো না ওটাতে ভালো না? শিশুর সামনে এরকম না বলাই ভালো। বরং আপনি কিসে কিসে ভালো সেটি তাকে বলুন। আরও ভালো হয় যদি তাকে বলতে পারেন আপনি নিজে ছোটবেলায় কি পারতেন না বা কি নিয়ে ভয়ে ছিলেন এবং কিভাবে আপনি সেটিকে জয় করেছেন। তাড়াহুড়ার কিছু নেই। ধীরে ধীরে সময় নিয়ে তাকে বুঝিয়ে বলুন। সে যদি কোন কিছুতে এখন ভালো নাও হয় সেটি কোন ব্যাপার না। আস্তে আস্তে চেষ্টার দ্বারা সে ভালো করতে পারবে।

৩। নিজের প্রশংসা নিতে না পারা

যখন আপনি আপনার সন্তানের প্রশংসা করেন তখন সে কিভাবে রিঅ্যাক্ট করে? সে কি খুশি হয়, গর্ববোধ করে, আপনার প্রশংসা গ্রহণ করে? নাকি অস্বচ্ছন্দবোধ করে, আপনার প্রশংসাকে উড়িয়ে দেয়? সহজ কথায়, সে কি আপনার প্রশংসায় বিশ্বাস করে? সে কি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে সে এই প্রশংসার দাবিদার? নাকি ভাবে যে আপনি মা অথবা বাবা বলে এরকমটা বলছেন?

কি করবেন এই সময়ে?

কেউ প্রশংসা করলে তাকে হাসিমুখে ধন্যবাদ দেয়ার অভ্যাস শেখান সন্তানকে। প্রশংসাকে হাসিমুখে বরণ করার স্বভাব এবং অভ্যাস তৈরি করা এই সমস্যার অর্ধেক যুদ্ধ জয়ের সমান।

অন্য কেউ আপনার কোন প্রশংসা করলে আপনি কেমন রেসপন্স করেন? আপনাকে দেখেও আপনার সন্তান শেখে। তাই আপনিও অন্যর প্রশংসাকে হাসিমুখে ধন্যবাদ দিয়ে গ্রহণ করুন।

৪। সমালোচনা গ্রহণ করতে না পারা

যেসব শিশুরা আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগে তারা অন্যর যেকোনো ধরণের সমালোচনা গ্রহণ করতে পারে না। কারণ এতে করে তার নিজের প্রতি নিচু ধারণাকে আরও পাকাপোক্ত করে। তাই গঠনমূলক সমালোচনা যদি আপনার শিশুর গ্রহণ করতে অথবা মেনে নিতে কষ্ট হয় তাহলে বুঝবেন তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব রয়েছে।

এক্ষেত্রে আপনার করণীয়ঃ

সমালোচনাকে পজিটিভভাবে তুলে ধরুন সন্তানের সামনে। তাকে বুঝান যে সমালোচনার মাধ্যমে আমরা আসলে নিজের শক্তিশালী এবং দুর্বল দিকগুলো আরও ভালোভাবে জানতে পারি। এটি তাকে ভবিষ্যতে সফল হতে সাহায্য করে।

খোলামেলাভাবে সমালোচনার ব্যাপারটি আলোচনা করুন। কিভাবে এটি একজন মানুষকে ভিন্নভাবে ভাবতে শেখায়, গঠনমূলক সমালোচনা থেকে সে নিজে কি শিখে আরও উন্নতি করতে পারে সেই ব্যাপারগুলো জানান।

৫। সহজেই হাল ছেড়ে দেয়া

যখন সন্তান নতুন কিছু শিখতে যায় বা করতে যায়, সে কি খুব তাড়াতাড়ি হাল ছেড়ে দেয়? সে কি খুব তাড়াতাড়িই বলে যে আমি পারবো না, আমাকে দিয়ে হবে না? যেসব শিশুদের আত্মবিশ্বাস কম থাকে সেসব শিশুরা ব্যর্থ হওয়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি হাল ছেড়ে দেয়। ব্যর্থ হওয়ার চেয়ে সে নিজে হাল ছেড়ে দিয়েছে বলে পারেনি – এটার মাধ্যমে তার ধারণা হয় যে ব্যাপারটির উপরে তার কন্ট্রোল আছে।

শিশুরা যখন ছোট থাকে তখন সাধারণত ব্যর্থ হওয়ার ভার নিজের কাঁথেই নেয়, আর বড় হতে থাকলে অন্য কোন কিছুর উপরে বা অন্য কারোর উপরে দোষ চাপানো শুরু করে। অনেক শিশু নীরবেই হাল ছেড়ে দেয় এবং কখনও আর চেষ্টা করে না।

এক্ষেত্রে আপনার করণীয়ঃ

তাকে জিজ্ঞেস করুন তার কেমন লাগবে সে যদি ভালোভাবে কাজটি করতে পারে। তাকে বলুন যেকোনো প্রয়োজনে সে চাইলে সাহায্য এবং সাজেশন নিতে পারে।

তাকে পুরো কাজটি ঠিকভাবে করার জন্য কিছু কৌশল শিখিয়ে দিতে পারেন। সেগুলো সে ধাপে ধাপে কিভাবে করতে পারে সে ব্যাপারে সাহায্য করুন। কিন্তু সাবধান থাকবেন আবার এই কাজটি করতে যেয়ে যেন আপনি নিজেই সবকিছু করে না দেন। পুরো ব্যাপারটিতে আপনার সাহায্যকারীর ভূমিকা থাকবে। সে যখন নিজে কাজ করবে, নিজে সিদ্ধান্ত নিবে এবং সফল হবে তাহলেই তার আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে। আপনি

আপনি সব করে দিলে কাজটি হয়তো হয়ে গেলো, কিন্তু আপনার সন্তানের আত্মবিশ্বাস এতে করে আরও তলানিতে যাবে।

আশা করি আপনি অভিভাবক কিংবা শিক্ষক হিসাবে যদি এই ধরণের কোন আচরণ শিশুর মধ্যে দেখেন, যাতে মনে হয় তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস কম আছে, তাহলে এই টেকনিকগুলো কাজে লাগাবেন।

চলুন আরেকবার ঝালাই করে নেই কি কি লক্ষণ দেখলে আপনি বুঝবেন যে আপনার সন্তানের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব রয়েছেঃ

১। নতুন কোন কাজ বা চ্যালেঞ্জ নিতে না চাওয়া

২। নিজের সম্পর্কে নেগেটিভ কথা বলা

৩। নিজের প্রশংসা নিতে না পারা

৪। সমালোচনা গ্রহণ করতে না পারা

৫। সহজেই হাল ছেড়ে দেয়

শেষ করার আগে এটা বলা ভালো যে উপরে যেসব লক্ষণের কথা আমরা বলছি সেগুলো সবসময় যে কেবল আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগছে এমন শিশুদের মধ্যে দেখা দিবে তা না। অনেক সময় আত্মবিশ্বাসী শিশুরাও কোন একটা কিছুতে ভুল করে বা ব্যর্থ হয়ে এরকম আচরণ করতে পারে। কিন্তু যদি এই আচরণগুলো নিয়মিতভাবেই শিশুর মধ্যে দেখা যায় তাহলে ধরে নিতে হবে যে শিশুর মধ্যে নিজের উপর বিশ্বাসের ঘাটতি রয়েছে। অতঃএব অভিভাবক হিসাবে আপনাকে অবশ্যই তার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে কাজ করতে হবে।

উপরের এই লক্ষণগুলোর এক বা একধিকগুলো যদি বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করেন আপনার সন্তানের মধ্যে দেখা দিচ্ছে, তাহলে এই লেখাটি আরেকবার পড়ে নিবেন।

অধ্যায় ৪

শিশুর আত্মনিয়ন্ত্রণ

পুরো বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার এটি। কারণ এই চ্যাপ্টারেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর সেটি হচ্ছে শিশুকে যত অল্পবয়স থেকে সম্ভব আত্মনিয়ন্ত্রণ (সেলফ-কন্ট্রোল) শেখানো।

একটা শিশু বড় হয়ে সফল হবে কিনা, জীবনে সুখী হবে কিনা – তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হচ্ছে শিশুর সেলফ-কন্ট্রোল আছে কিনা।

শিশুকে আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখানো কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

অভিভাবক হিসাবে নিজেদের সন্তানের কাছে আমাদের কিছু চাহিদা থাকে। পড়াশুনা করবে মনোযোগ দিয়ে, মা-বাবার কথা শুনবে, ভালো আচরণ করবে ইত্যাদি। নিজের সন্তানের মধ্যে যে গুণগুলো আমরা দেখতে চাই সেখানে আত্মনিয়ন্ত্রণের (self-control) স্থান আসলে আছে কি?

আমরা আমাদের আগের চ্যাপ্টারে লিখেছি কিভাবে আমরা শিশুদের 'চাওয়া' এবং 'দরকারের' পার্থক্য সম্পর্কে শেখাতে পারি। কেনই বা বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ। 'চাওয়া' আর 'দরকারের' মধ্যে পার্থক্য যখন শিশু বুঝে যাবে এবং নিজে সেটি বলতে পারবে, এরপর তাকে আত্মনিয়ন্ত্রণ (self-control) শেখানোর সময় এসেছে।

আপনার কাছে মনে হতে পারে, হুম, ভালোই হয় এটা যদি শিখে যায় শিশু। কিন্তু এর জন্য তো এত মাথা ঘামানোর কিছু নেই। পড়াশুনা ঠিকমতো করছে কিনা সেটিই তো ঠিকমতো দেখতে পারি না। তার উপর আবার এইসব জিনিস!

গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব শিশুর মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব আছে তারা স্কুলে রেজাল্ট খারাপ করে। এছাড়া তাদের মধ্যে উদ্বেগ, ডিপ্রেশন এবং আক্রমণাত্মক আচরণ লক্ষ্য করা যায়।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব আছে যেসব শিশুর মধ্যে তারা ভবিষ্যতে খারাপ স্বাস্থ্য, মাদকের প্রতি ঝুঁকে যাওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। কম সম্পদের অধিকারী হওয়া এবং অপরাধ প্রবণতার হার বেশি হয়।

এক কথায়, অভিভাবক হিসাবে আপনি যা কিছু শিশুর বর্তমান এবং ভবিষ্যতে দেখতে চান তার সবকিছুই দেখবেন যদি শিশুর মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের গুণটা থাকে। এবং এইজন্যই অভিভাবক হিসাবে শিশুকে আত্মনিয়ন্ত্রণ (self-control) শেখানো এত গুরুত্বপূর্ণ।

‘সবুরে মেওয়া ফলে’ – কথাটি কিন্তু হাড়ে হাড়ে সত্যি। তাই শিশুদের শিখতে সাহায্য করুন যে, দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনেক সময় তাৎক্ষনিক পুরষ্কারের চেয়ে অপেক্ষা করলে আরও ভালো পুরষ্কারের পাওয়া যায়। সেটি আপনার শিশুর বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দুটো ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

কিন্তু আসলেই কি শিশুরা নিজেদের কন্ট্রোল করতে পারে? এক্ষেত্রে শিশুর অবশ্যই অনেক বড় একটা বিষয়। দুই বছরের কম বয়সী শিশুরা নিজেদের কন্ট্রোল করতে পারে না। তাদের সামনে একটি চকলেট রাখলে সেটি সে নেয়ার জন্য হাত বাড়াবেই। কারণ এখনও তার মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের কোন ব্যাপার তৈরি হয়নি। তাই শিশুর বয়স যখন ৩-৭ বছর বয়স তখন শিশুকে আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখানোর সবচেয়ে উপযুক্ত সময় ।

পৃথিবী বিখ্যাত একটা গবেষণাঃ মার্সমেলো পরীক্ষা

শিশুদের আত্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে একটা খুব মজার পরীক্ষা আছে যার নাম ‘মার্সমেলো পরীক্ষা’। মার্সমেলো শিশুদের কাছে অত্যন্ত মজার একটা খাবার । স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির ওয়াল্টার মিশেল এই পরীক্ষাটি করেছিলেন। পরীক্ষায় তিনি প্রথমে শিশুদের জিজ্ঞেস করেন, তারা কি একটি নাকি দুটি মার্সমেলো নিতে চায়? তখন সবাই বলে যে তারা দুইটি নিতে চায়। এটাই স্বাভাবিক। একটির চেয়ে যে দুটি ভালো সেটা সবাই জানে।

এরপর মিশেল শিশুদের বলেন, এই যে প্লেটে আমি একটা মার্সমেলো রেখে যাচ্ছি। আমি এখন একটু রুমের বাইরে যাচ্ছি। আমি ফেরত আসার পর যদি দেখি যে তুমি মার্সমেলোটি খাওনি, তাহলে তুমি আরেকটা মার্সমেলো পাবে। তুমি যদি অপেক্ষা করতে না পারো এবং খেয়ে ফেলো তাহলেও কোন সমস্যা নেই। তখন তুমি আরও একটা যেটা পেতে সেটি পাবে না। কিন্তু যদি এটি না খেয়ে অপেক্ষা কর তাহলে সাথে আরও একটা বোনাস পাবে। তখন দুটোই খেতে পাবে।

এইটুকু বলে তিনি বাইরে চলে যেতেন।

কি ঘটে বলুন তো?

পরীক্ষায় দেখা গেছে যে ২ বছর বা তার নিচের সব শিশুই মিশেল বের হয়ে যাওয়ার পরপরই প্লেটে রাখা কুকি খেয়ে ফেলছে। তাদের যতই ইচ্ছা থাকুক না কেন আরেকটা কুকি খাওয়ার, সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কারণ এই বয়সী শিশুর মধ্যে এখনও আত্মনিয়ন্ত্রণ এখনও তৈরি হয়নি। তাই সাধারণত ৩ বছর বয়সের নিচের শিশুদের আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখাতে না যাওয়াই ভালো।

কিন্তু প্রি-স্কুলে ভর্তি হয়েছে এমন শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা গেল চিত্রটা কিছুটা ভিন্ন। ৩-৬ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ৭০% শিশু নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে না, দ্বিতীয় কুকি বা মার্সমেলো পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে যতই থাকুক না কেন।

কিন্তু বাকি ৩০% শিশু তার পছন্দের জিনিসটি নিলো না বা খেলো না। তাদেরও প্রচণ্ড ইচ্ছে করছিল। কিন্তু তারা নিজেদের বুঝিয়েছে, বা এমন সব পদ্ধতি অবলম্বন করেছে যেন তারা কুকি বা মার্সমেলোর কথা ভুলে থাকতে পারে।

এরপর এই শিশুদের রেকর্ড রাখা শুরু হল গবেষণার জন্য। যেসব শিশুরা আত্মনিয়ন্ত্রণ দেখাতে পেরেছিল, তারা স্কুলে ভালো করছে, তাদের বন্ধুদের সাথে ভালোভাবে মিশছে, তাদের অভিভাবকরা তাদের উপর বেশি সন্তুষ্ট। তারা বেড়ে উঠছে বেশি দক্ষ, আত্মবিশ্বাসী এবং সুখি হয়ে। এমনকি তাদের SATS স্কোর ২০০ মার্ক বেশি সাধারণের তুলনায় । তাই শিশুর একাডেমিক রেজাল্ট ভালো হবে কিনা সেটা অনুমান করার জন্য মার্সমেলো টেস্ট IQ টেস্ট থেকেও বেশি কার্যকর।

১৯৬৮ সালে করা এই পরীক্ষায় যেসব শিশু অংশ নিয়েছিল তাদের পরবর্তী ৪০ বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যেসব শিশুরা নিজেদের

নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিল এই পরীক্ষায় তারা এখন অন্যদের তুলনায় স্বাস্থ্যবান, ধনী, সুখী এবং জীবনে তাদের অর্জন বেশি।

প্রিয় অভিভাবক এবং শিক্ষকগণ, তাহলে এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন শিশুদের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের গুণটি তৈরি করা কতটা জরুরি।

এখন প্রশ্ন হল, কিভাবে আমরা শিশুদের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের গুণটি তৈরি করতে পারি। সেই প্রশ্নের জবাব থাকছে বইয়ের পরের অংশে।

আত্মনিয়ন্ত্রণ (সেলফ-কন্ট্রোল) কিভাবে শেখানো যায় শিশুকে?

একটা শিশুকে আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখানোর সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হচ্ছে তাকে 'দরকার' এবং 'চাওয়া' – এই দুইটি বিষয়ের সাথে ভালো করে পরিচয় করিয়ে দেয়া। মানে, Need vs Want – এই দুইয়ের পার্থক্য করতে পারা।

চলুন ব্যাপারটি সম্পর্কে আরেকটু ভালোমতো বুঝি।

কোন কিছু কেনাকাটা করতে গিয়েছেন। সাথে আপনার শিশু। কখনও খেলনা, কখনও চকলেট বা আইসক্রিম, কখনও বা নতুন জামার বায়না – একটা কিছু থাকবেই শিশুর। এমন অভিজ্ঞতা সব অভিভাবকদেরই আছে। সবসময় আমাদের কাছে শিশুর নতুন নতুন সব বায়না বা চাওয়া পূরণ করা সম্ভব হয় না আমাদের জন্য। আর শিশুর সব চাওয়াই কি পূরণ করা উচিত? আজকের লেখার বিষয়বস্তু শিশুদেরকে আমরা কিভাবে 'দরকার এবং চাওয়া' এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে বুঝাতে পারি সেটি নিয়ে।

প্রথমেই কথা উঠতে পারে, অভিভাবক হিসাবে তাহলে কি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমরা শিশুদের 'চাওয়া' পূরণ করবো না? দেখুন, আমরা খুব সচেতনভাবে 'চাওয়া' শব্দটি উল্লেখ করছি। অভিভাবক হিসাবে আমাদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানের যা 'দরকার' সেগুলো পূরণ করা। এবং এরপর সামর্থ্য থাকলে সন্তানের 'চাওয়া'গুলোর দিকে নজর দেয়া।

আর শিশুর সব চাওয়াই যদি আপনি ক্রমাগত কোন বাধা ছাড়া পূরণ করতে থাকেন তাহলে কোনদিনই তার মধ্যে দায়িত্ববোধ তৈরি হবে না। এবং এক সময় এমন অনেক কিছুর দাবি করে বসবে তখন আপনি শুধু টাকা থাকার কারণেই যে দিতে পারবেন এমন নয়।

শিশুরা খুব সহজেই তার 'দরকার' এবং 'চাওয়া'র মধ্যে পার্থক্য গুলিয়ে ফেলে। তারা বুঝতে পারে না তার 'দরকার' এবং 'চাওয়া'র মধ্যে তফাত কোথায়। অথচ এই বিষয়টি শিশুদের বুঝানো খুব গুরুত্বপূর্ণ। ছোটবেলা থেকেই 'দরকার' ও 'চাওয়া' এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারার দক্ষতা পরবর্তীতে শিশুকে ফাইনান্সিয়ালি দক্ষ করে তুলে।

প্রথমেই তাহলে শিশুকে বুঝাতে হবে কোনটা তার 'দরকার' আর কোনটা তার 'চাওয়া'। এটা একবার সে ছোট বয়সে বুঝে গেলে তার মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ তৈরি হবে। আর আত্মনিয়ন্ত্রণ যে শিশুর মধ্যে তৈরি হবে, বড় হলে সফল হওয়ার সম্ভাবনা তার মধ্যে অনেক বেশি হবে।

Teaching Need Vs Want: কোনটা 'দরকার' আর কোনটা 'চাওয়া'?

'দরকার' এবং 'চাওয়ার' পার্থক্য বুঝানোর জন্য সহজ উপায় হল শিশুকে খুব সহজ উদারহণ দিয়ে বুঝানো। 'দরকার' হল সেসব জিনিস যেগুলো না হলে আমাদের চলবে না। যেমন খাবার, থাকার জায়গা, কাপড় ইত্যাদি । আবার 'চাওয়া' হল যেগুলো না হলেও আমাদের চলবে – যেমন চকলেট, আইসক্রিম, খেলনা।
শিশুর সাথে এই ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করুন। যেমন, পত্রিকায় বা মাগাজিনে অনেক জিনিসের ছবি দেয়া থাকে। থাকে। সেগুলো দেখিয়ে বলতে পারেন তাকে বলতে যে কোনটা 'দরকার' আর কোনটা 'চাওয়া'। সুপার মার্কেটে বা বাজার করতে যান অনেকেই শিশুদের নিয়ে। তখন শেলফে থাকা জিনিসগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারেন কোনটা 'দরকার' আর কোনটা 'চাওয়া'। যেমন, আপনি যখন চাল কিনবেন

এখন বলুন যে আমরা যেহেতু ভাত খাই তাই চাল আমাদের 'দরকার'। কিন্তু বিস্কিট বা চকলেট হল আমাদের 'চাওয়া'।

আমরা অনেক সময় শিশুদের বাজার করতে নিয়ে যেতে চাই না। কারণ নিলেই এটা মেটা কিনতে চায়। আমরা বরং বলবো মেটা না করে বরং তাকে নিয়ে যান। নিজের বাজারের তালিকা দেখিয়ে সেগুলো খুঁজে বের করতে বলুন। দোকানে গেলেই এটা-মেটা কেনার বায়না ধরে বলেই তাকে নিয়ে যাবেন না, মেটা সমাধান না। মাথা ব্যাথা হলে মাথা কেটে ফেলা কোন সমাধান না।

এরকম বিভিন্ন জায়গায় শিশুকে যখন নিয়ে যাবেন বা তার সাথে সময় কাটাবেন তখন তাদের সাথে খেলার ছলে 'দরকার আর চাওয়া' ব্যাপারটা শিখিয়ে দিতে পারেন। শিশু মোটামুটি বুঝে ফেললে তাকে তার 'দরকার' আর 'চাওয়া'র তালিকা তৈরি করতে দিন। সেখানে হয়তো তার দরকারের তালিকায় থাকবে পেন্সিল, কলম, খাতা, বই, ব্রাশ, জুতা, জামা থেকে শুরু করে তার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের তালিকা। অপরদিকে তার 'চাওয়া'র তালিকায় থাকতে পারে লাল বল, তার প্রিয় কোন খেলনা, ব্যাট-বল থেকে শুরু করে মাইকেল মোবাইল ইত্যাদি।
তাকে বড় একটা চার্ট করে দিতে পারেন যেন সে যেখানে কোন জিনিসের ছবি দেখবে সেখান থেকে কেটে এনে লাগাতে পারে। এটি খুব মজার একটা খেলাও হবে তার জন্য, পাশাপাশি আপনি আপনার শিশুর চাওয়াগুলোও বুঝতে পারবে।

শিক্ষকরা ক্লাসে শিশুদের সাথে মিলে নিচের ছবির মত একটা চার্ট তৈরি করতে পারেন। 'দরকার' আর 'চাওয়া' নিয়ে শিশুদের সাথে একটি ক্লাসে আলোচনা করে দেখুন। অনেক মজার সব আলোচনা হবে, পাশাপাশি শিশুরা দারুণ একটা ব্যাপার শিখবে। 'দরকার' বনাম 'চাওয়া'র চার্টটি দেয়ালে ঝুলিয়ে দিন এবং শিশুদের বলুন মাঝে মাঝে সেটিতে নতুন জিনিস যোগ করতে।

তখন বলুন যে আমরা যেহেতু ভাত খাই তাই চাল আমাদের 'দরকার'। কিন্তু বিস্কিট বা চকলেট হল আমাদের 'চাওয়া'।

আমরা অনেক সময় শিশুদের বাজার করতে নিয়ে যেতে চাই না। কারণ নিলেই এটা সেটা কিনতে চায়। আমরা বরং বলবো সেটা না করে বরং তাকে নিয়ে যান। নিজের বাজারের তালিকা দেখিয়ে সেগুলো খুঁজে বের করতে বলুন। দোকানে গেলেই এটা-সেটা কেনার বায়না ধরে বলেই তাকে নিয়ে যাবেন না, সেটা সমাধান না। মাথা ব্যাথা হলে মাথা কেটে ফেলা কোন সমাধান না।

এরকম বিভিন্ন জায়গায় শিশুকে যখন নিয়ে যাবেন বা তার সাথে সময় কাটাবেন তখন তাদের সাথে খেলার ছলে 'দরকার আর চাওয়া' ব্যাপারটা শিখিয়ে দিতে পারেন। শিশু মোটামুটি বুঝে ফেললে তাকে তার 'দরকার' আর 'চাওয়া'র তালিকা তৈরি করতে দিন। সেখানে হয়তো তার দরকারের তালিকায় থাকবে পেন্সিল, কলম, খাতা, বই, ব্রাশ, জুতা, জামা থেকে শুরু করে তার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের তালিকা। অপরদিকে তার 'চাওয়া'র তালিকায় থাকতে পারে লাল বল, তার প্রিয় কোন খেলনা, ব্যাট-বল থেকে শুরু করে সাইকেল মোবাইল ট্যাব ইত্যাদি।
তাকে বড় একটা চার্ট করে দিতে পারেন যেন সে যেখানে কোন জিনিসের ছবি দেখবে সেখান থেকে কেটে এনে লাগাতে পারে। এটি খুব মজার একটা খেলাও হবে তার জন্য, পাশাপাশি আপনি আপনার শিশুর চাওয়াগুলোও বুঝতে পারবে।

শিক্ষকরা ক্লাসে শিশুদের সাথে মিলে নিচের ছবির মত একটা চার্ট তৈরি করতে পারেন। 'দরকার' আর 'চাওয়া' নিয়ে শিশুদের সাথে একটি ক্লাসে আলোচনা করে দেখুন। অনেক মজার সব আলোচনা হবে, পাশাপাশি শিশুরা দারুণ একটা ব্যাপার শিখবে। 'দরকার' বনাম 'চাওয়া'র চার্টটি দেয়ালে ঝুলিয়ে দিন এবং শিশুদের বলুন মাঝে মাঝে সেটিতে নতুন জিনিস যোগ করতে।

দরকার এবং চাওয়ার তালিকাঃ

আমার যা দরকার	আমি যা চাই করনীয়

ক্লাসের দেয়ালে টাঙিয়ে দিন 'দরকার' বনাম 'চাওয়া' চার্ট

এভাবে একটা শিশু যখন কোনটা তার চাওয়া আর কোনটা তার দরকার – এটা বুঝতে পারবে, তাহলে তার জন্য নিজেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে।

আত্মনিয়ন্ত্রণ কিভাবে শেখাবেন আপনার শিশুকে?

আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি কেন আপনার সন্তানকে আত্মনিয়ন্ত্রণ (self-control) শেখানো জরুরি। যেসব শিশুর আত্মনিয়ন্ত্রণ বেশি তারা পড়াশুনা থেকে শুরু করে ভবিষ্যতে ভালো চাকুরি, এবং ব্যক্তিগত জীবনে সুখী হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। এখন প্রশ্ন হল কিভাবে আমরা আমাদের সন্তানদের আত্মনিয়ন্ত্রণ (self-control) শেখাতে পারি।

আমরা ইতিমধ্যে জানলাম আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখার জন্য 'দরকার' আর 'চাওয়া' – এই দুইটাই কনসেপ্ট শিশুকে ক্লিয়ারলি বুঝাতে হবে। তাতে করে তার জন্য নিজের জীবনের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কাজে আসবে।

এবার আমরা কিছু সাধারণ নিয়মের কথা বলবো যেগুলো মেনে চললে অভিভাবক (এবং শিক্ষকরা) শিশুদের আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখাতে পারেন। চলুন তাহলে সেই নিয়মগুলো সম্পর্কে জেনে নেই।

তবে শুরু করার আগে একটি কথা বলে নেয়া ভালো যে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রধান ভিত্তি হল 'বিশ্বাস'। শিশু যদি আপনাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে তাহলেই সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

উদাহরণ দেই। তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। মনে করুন, শিশুকে আপনি বলেছেন যে যদি সে পরীক্ষায় ভালো করে তাহলে তাকে অমুক জিনিসটি কিনে দিবেন। তাই এখন সে বেশি কার্টুন না দেখে যেন পড়ায় বেশি মনোযোগ দেয়। এরকম প্রমিজ অভিভাবকরা নিয়মিতভাবে করে থাকেন। যাই হোক, ধরুন এই কথা শুনে শিশু সত্যি সত্যি অনেক মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করলো। এখন ফলাফল কি হতে পারে?

হয়তো আপনার চাওয়া অনুযায়ী ফলাফল করতে পারলো, কিংবা

হয়তো পারলো না। কিন্তু পরিশ্রম হয়তো সে ঠিকই করেছে। দুটোর যেটাই হোক না কেন, পরীক্ষার ফল দেয়ার পর কিন্তু শিশু ঠিকই মনে রাখবে যে আপনার উপহার দেয়ার কথা। তখন যদি আপনি সেটি না দেন তাহলে শিশু আপনার উপর বিশ্বাস হারাবে।

এরপর থেকে আপনি আবারও যদি এরকম কোন একটা শর্ত দিয়ে কাজ আদায় করে নিতে চান, সেক্ষেত্রে আগেরবারের মত আপনাকে আর বিশ্বাস করবে না শিশু। তাই তখন সে ভবিষ্যতে কিছু পাওয়ার আশায় (আপনার উপহার) এখনকার আত্মনিয়ন্ত্রণের প্র্যাকটিস (কার্টুন না দেখা) আর করবে না। কারণ আপনি তার বিশ্বাস একবার ভেঙেছেন। এইজন্য সন্তানকে কোন আশা বা পুরস্কার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়ার আগে ভালোমতো ভেবে নিন।

এখন যদি বুঝে থাকেন যে কি ধরণের বিশ্বাসের কথা বলছি তাহলে আমরা পরবর্তী ধাপগুলো বা নিয়মগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারি। চলুন দেখে নেই ৫ টি উপায়ের কথা যার মাধ্যমে আপনি শিশুকে কিংবা আপনার শিক্ষার্থীকে আত্মনিয়ন্ত্রণ (self-control) শেখাতে পারেন। এগুলোর সবগুলোই যে আপনাকে মেনে চলতে হবে তা নয়। তবে যত বেশি পারবেন তত ভালো এবং এটিকে আপনার অভ্যাসের মধ্যে নিয়ে আসতে পারাটা গুরুত্বপূর্ণ। ৫-৬ মাস করে বাদ দিলেন তাহলে কিন্তু হবে না।

আর ভালো কথা, এই ৫ টি উপায় পৃথিবীর অনেক বড় বড় শিশু বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে এবং তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা তৈরি করেছি আপনাদের জন্য।

১। শিশুকে তার আবেগ বুঝতে সাহায্য করুন

যেসব শিশুরা তাদের নিজেদের আবেগ বুঝতে পারে না তাদের সাধারণত আত্মনিয়ন্ত্রণ কম থাকে। যে শিশু বলতে পারে না 'আমি রাগ করেছি', সে শিশু সাধারণত কিছু ভাঙে বা কাউকে আঘাত করে তার

রাগ প্রকাশের জন্য। যে শিশু বলতে পারে না 'আমার মন খারাপ', সে শিশু হয়তো মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি করে আর কান্নাকাটি করে তার মন খারাপ প্রকাশের জন্য।

শিশুকে তার আবেগ বুঝতে সাহায্য করুন। তাকে বলুন যে রাগ করা, মন খারাপ করা স্বাভাবিক। কিন্তু রাগ করে কোন কিছু ভাঙা বা কাউকে আঘাত করা অনুচিত। এই কাজটা করে ফেলতে হবে তার বয়স যখন ৩-৪ বছর এই সময়ের মধ্যেই।

আবেগ এবং আচরণ কিন্তু দুটি ভিন্ন জিনিস। এই ব্যাপারটি শেখানোর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল শিশুকে তার আবেগকে শনাক্ত করা শেখানো।

গুফির একটা গল্পের বইয়ের সিরিজ আছে। নাম হচ্ছে EI Series. মানে হল, Emotional Intelligence Series. এই সিরিজে গল্পের ছলে শিশুকে আত্মনিয়ন্ত্রণ, এবং আবেগীয় দক্ষতা শেখানো হয়েছে। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এটা একমাত্র বইয়ের সিরিজ যেখানে আবেগীয় দক্ষতা শেখানোর উপর কাজ করা হয়েছে।

২। খুব পরিষ্কারভাবে নিয়ম ঠিক করে দিন

ছোট শিশুদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি। ২-৫ বছর বয়সী শিশুরা অনেক সময় আপনার বলে দেয়া নিয়ম ফলো করতে পারে না। কারণ তারা খুব একটা মনোযোগ দিয়ে শুনে না। তাই কোন নিয়ম বলার পর তাকে আরেকবার বলতে বলুন। নিয়ম ঠিক করার সাথে সাথে সেটার কারণটাও অবশ্যই তাকে বলুন। সে যেন বুঝতে পারে কেন এই নিয়মটি করা হয়েছে তার জন্য।

শিশুরা যেহেতু খুব দ্রুত কোন কিছু ভুলে যায় তাই যে কোন নিয়ম তাকে বার বার মনে করিয়ে দিতে হবে। মনে করুন, খেলার পর তার সব খেলনা গুছিয়ে রাখার দায়িত্ব আপনি শিশুকে দিয়েছেন। তাই খেলা শেষ

হওয়ার পর সে যদি সেগুলো মাটিতে এলোমেলো করে ফেলে চলে যায়, তাহলে তাকে ডেকে মনে করিয়ে দিন এবং গুছিয়ে রাখতে বলুন। নিজে নিজে গুছাতে যাবেন না।

শিশুর বয়স ৭ বছর হয়ে গেলে এই সমস্যা থাকার কথা নয়। তখন সে এক-দুইবার বললেই বুঝে যাওয়ার কথা।

৩। বার বার মনে করিয়ে দিন

সন্তানের জন্য যেসব নিয়ম আপনি সেট করে দিয়েছেন সেগুলো মাঝে মাঝেই মনে করিয়ে দিন যখন সে ভুলে যাচ্ছে। শিশুরা অল্পতেই ভুলে যায়। সেটাই স্বাভাবিক। তাই অভিভাবক হিসাবে আপনার দায়িত্ব হচ্ছে আপনার সন্তানকে বার বার মনে করিয়ে দেয়া। বিরক্ত হওয়া যাবে না। এরকম বার বার মনে করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে এক সময় সে আত্মনিয়ন্ত্রণ শিখবে।

ধরুন, আপনার সন্তানের জন্য প্রতিদিন ১ ঘণ্টা সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে কার্টুন দেখার জন্য কিংবা মোবাইলে গেম খেলার জন্য। কিন্তু কোন কোন সময়ে সে মোট ১ ঘণ্টা কার্টুন দেখতে সেটা ওকেই ঠিক করতে দিন। সে হয়তো স্কুল থেকে ফিরে বিকালে ৩০ মিনিট দেখতে চায়। আবার হয়তো সন্ধ্যায় খাবার আগে ৩০ মিনিট দেখতে চায়। তাকে তার মতো করে সেট করতে দিন। এরপর আপনার দায়িত্ব হচ্ছে সে যদি এক ঘণ্টার বেশি কার্টুন দেখে সেটি তাকে মনে করিয়ে দেয়া। তাকে বলুন যে সে নিজেই ঠিক করেছে যে দিনে ১ ঘণ্টা কার্টুন দেখবে। কিন্তু আজকে সে ইতিমধ্যে বেশি দেখে ফেলেছে।

৪। অপেক্ষা করাকে উৎসাহিত করুন

শিশুরা কোন কিছু পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে রাজি হয়না। তাদের ধৈর্য অনেক কম। কিন্তু অপেক্ষা করে কিছু পাওয়া (delayed gratification) শেখানো অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এতে করেই শিশুর মধ্যে

আত্মনিয়ন্ত্রণ তৈরি হয়। শিশুকে আপনি শেখাবেন যে অপেক্ষার ফল সবসময় ভালো হয়। কথায় বলে না, সবুরে মেওয়া ফলে।

অনেক সময় আপনার সন্তানকে শেখাতে হবে কিভাবে সে অপেক্ষা করতে পারে। নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে।

যেমন, অনেক সময় শিশুরা খেলনা কেনা বা আইসক্রিম খাওয়া নিয়ে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে শিশুকে বুঝান অপেক্ষা করার জন্য। কোন কিছু চাওয়া মাত্র যদি শিশু সেটি পেতে থাকে তাহলে সে কোনদিন আত্মনিয়ন্ত্রণ শিখবে না।

আপনার হয়তো শিশু যা চাচ্ছে তাই কিনে দেয়ার ক্ষমতা আছে। তাই বলে সবসময় চাওয়া মাত্র কিনে দিবেন না। কিনে দিলেও কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলুন। আজকে সে আইসক্রিম কেনার জন্য বায়না ধরছে, বড় হয়ে বাইক, মোবাইল, গাড়ির জন্য ধরবে। একটা সময় এমন জিনিস চাইবে আপনার কাছে, যেটা দেয়ার ক্ষমতা আপনার আর থাকবে না। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। তখন আর শত নিষেধ করলেও লাভ হবে না।

শিশুরা কিভাবে নিজেদের কন্ট্রোল করতে পারে তার উপর বেশ কিছু টেকনিক তাকে শিখিয়ে দিতে পারেন। সেগুলো নিয়ে আমরা পরের একটি লেখায় আলোচনা করবো।

৫। সন্তানের সামনে নিজেকে রোল মডেল হিসাবে তুলে ধরুন

আপনার সন্তানের সামনে প্রথম রোল মডেল হচ্ছেন আপনি। শিশু যতই ছোট হোক না কেন সে প্রতিনিয়ত আপনাকে ফলো করে। তাই শিশুর সামনে নিজেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের রোল মডেল হিসাবে তুলে ধরুন। আপনার আচরণ যেন সংযত এবং পরিবারের সবার সাথে সম্মানজনক থাকে সেদিকে খেয়াল রাখবেন। রেগে যাওয়া, বকাবকি করা থেকে শুরু করে অন্য সব কাজে যেন আপনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন

সেদিকে খেয়াল রাখবেন। এমনকি আপনার বাসার কাজের মানুষটার প্রতিও যেন আপনার সহানুভূতিশীল আচরণ থাকে।

আপনার মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব থাকলে সেটি আপনার সন্তানের মধ্যেও দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সবকিছুকে পজিটিভভাবে নিন এবং সেরকম ব্যাবহার করুন।

এর পাশাপাশি অন্য বিখ্যাত রোল মডেলদের নিয়েও শিশুর সাথে কথা বলুন। এতে করে তার মধ্যে ওই রোল মডেলদের গুণাবলি অনুকরণ করার সম্ভাবনা থাকবে।

আপনার সন্তানের বয়স ২-৩ বছর হওয়ার থেকেই এই ৫টি নিয়মের দিকে একটু বিশেষভাবে খেয়াল রাখবেন। এতে আশা করা যায় আপনার শিশুর মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ দক্ষতা তৈরি হবে খুব ভালো।
শেষ করার আগে আরও একবার মনে করিয়ে দিতে চাই, একটি শিশুর ভবিষ্যৎ কতটা উজ্জ্বল হবে সেটির অনেক বড় একটা মাপকাঠি হচ্ছে, আপনার শিশুর মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের গুণ কতটা আছে সেটি। তাই এই বিষয়টি খুব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন এই কামনা করছি।

অধ্যায় ৫

সন্তানের ফাইনান্সিয়াল লিটারেসি

টাকা-পয়সার সাথে শিশুর পরিচয়

আপনি কি ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন যে শিশুর সাথে টাকা নিয়ে কথা বলা উচিত? ধরুন ৪-৫ বছর বয়সের শিশু।

আপনার উত্তরটি কি ভুল না সঠিক, সেটা এই লেখার শেষে জানে যাবেন।

আমরা একবার ৫০ টি স্কুলের ১০০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ করিয়েছিলাম কিভাবে শিশুদের নিজের লক্ষ্য বাস্তবায়নে পরিকল্পনা শেখানো যায়, তাদেরকে সঞ্চয় করতে উৎসাহ দেয়া যায় এবং তাদের অর্থনৈতিক শিক্ষা (financial literacy) দেয়া যায়। সেই প্রশিক্ষণের শুরুতে আমরা সব শিক্ষককে একটি প্রশ্ন করেছিলাম, 'আপনার কি

মনে হয় অভিভাবক হিসাবে আমাদের টাকা নিয়ে কথা বলা উচিত?'

উপস্থিত সবাই শিক্ষক হলেও তার মধ্যে বেশিরভাগই নিজেরাও অভিভাবক। তাই অভিভাবক এবং শিক্ষক – দুটো রোল থেকেই তারা প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছিলেন। ৯০ ভাগের উপর বলেছেন, শিশুদের সাথে টাকা নিয়ে কথা বলা উচিত না।

প্রশিক্ষণ শেষে আবারও সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম আমরা, এখন কি মনে করেন? শিশুর সাথে কি টাকা নিয়ে কথা বলা উচিত? এবার শতভাগ মতামত দিলেন যে, হ্যাঁ, শিশুর সাথে টাকা নিয়ে কথা বলা উচিত।

এখন প্রশ্ন হল, আমরা কিভাবে তাদের বুঝিয়েছি যে কেন শিশুর সাথে টাকা নিয়ে কথা বলা গুরুত্বপূর্ণ আর কিভাবেই বা তারা শিশুদের সাথে টাকা নিয়ে কথা বলবেন।

কেন শিশুর সাথে টাকা নিয়ে কথা বলা উচিত?

শিশুরা খুব অল্প বয়স থেকেই টাকার সাথে পরিচিত হয়। তারা বড়দের দেখে কোন কিছু কিনে তারা কাগজের কিছু নোট দেয়। টাকা বা উপার্জনের কোন ধারণা তৈরি না হলেও তারা বুঝতে পারে এই কাগজটি দিয়ে তারা বিভিন্ন জিনিস কিনতে পারে। কিন্তু তারা জানে না টাকা কোথা থেকে আসে বড়দের কাছে। শহরের অনেক শিশুর ধারণা টাকা আসে ATM Booth থেকে। এবং শিশুদের মধ্যে ধারণা থাকে যে টাকা বুঝি অফুরন্ত। সে কারণেই যখন শিশু কোন একটা কিছু কিনতে চায়, কিন্তু অভিভাবক বা অন্য কেউ কিনে দেয় না, তখন সে খুব অবাক হয়। সে বুঝে না কেন বাবা-মা তাকে কিনে দিতে চাচ্ছে না। একটু কষ্ট করে ATM Booth এ গেলেই তো হয়।

টাকা যে উপার্জন করতে হয় কাজ করে সেটিই তারা জানে না। অনেক অভিভাবককে বলতে শুনেছি, তার শিশু বলছে টাকা নাকি বুথে

গেলেই উঠানো যায়।

এইজন্য প্রথমেই শিশুকে এটি বোঝানো দরকার যে টাকা কাজ করে উপার্জন করতে হয়। বাবা-মা অফিসে যান, সেখানে কাজ করেন এবং মাস শেষে একটা নির্দিষ্ট টাকা পান। এরকম বড়রা সবাই কোনও না কোন কাজ করে টাকা উপার্জন করে। আর টাকা যেহেতু সীমিত, তাই আমাদের খরচ করতে হবে এমনভাবে যেগুলো আমাদের 'দরকার'।

শিশু বয়স যখন ৩ বছরে পা দেয় তখন থেকেই যদি তাকে বুঝান যে টাকা কি এবং টাকা যে কাজ করে উপার্জন করতে হয়, তাহলে তার মধ্যে ধীরে ধীরে এই বোধটা তৈরি হয়। বিভিন্ন ধরণের টাকার নোটগুলো তাকে চেনাতে পারেন। শিশুরা যখন সংখ্যা চিনতে থাকে তখন টাকার নোটে লেখা সংখ্যাগুলো দেখিয়ে চেনাতে পারেন।

সবচেয়ে বড় যে কারণে আপনার শিশুর সাথে টাকা নিয়ে কথা বলা উচিত সেটি হল, যখন আপনি অল্প বয়স থেকেই টাকা নিয়ে কথা বলবেন এবং টাকার মূল্য নিয়ে কথা বলবেন তার মধ্যে ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক স্বাক্ষরতা তৈরি হবে। এটি এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে গবেষণায় দেখা গেছে যেসব শিশুরা ছোটবেলা থেকে টাকা উপার্জন, টাকার মূল্য, সঞ্চয় করা ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে জানে এবং নিজেদের জীবনে কাজে লাগায়, তাদের মধ্যে বড় হয়ে অর্থনৈতিকভাবে সফল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

টাকার মূল্যের ব্যাপারে অবহিত হওয়ার মাধ্যমেই শিশুরা বুঝতে পারে তার কোন 'দরকারটা' আর কোন 'চাওয়াটা' সে পূরণ করতে পারবে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়ে। কারণ তার 'দরকার' অথবা 'চাওয়া' পূরণে অনেক সময় টাকার দরকার পরে। আর এর মাধ্যমেই ধীরে ধীরে তার মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ বাড়ে এবং কোন কিছু পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করার অভ্যাস তৈরি হয়। এই দুটো জিনিসই খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনার শিশুর জন্য।

টাকা নিয়ে শিশুর সাথে কথা বলা উচিত কিনা এই প্রশ্নের জবাবে আশা করি শতভাগ না হলেও বেশিরভাগ অভিভাবক এখন একমত হবেন।

কিভাবে শিশুকে টাকা সম্পর্কে ধারণা দিবো?

অভিভাবকদের জন্য কিছু ধাপ আমরা তৈরি করেছি যেগুলো আপনি আপনার মনে গেঁথে নিন।

টাকার সম্পর্কে ধারণা দেয়ার ধাপগুলোঃ

১। টাকা যে উপার্জন করতে হয় সেটি শিশুকে বলুন। বিভিন্ন পেশার মানুষ বিভিন্ন কাজ করার মাধ্যমে টাকা উপার্জন করে। তাকে উদারহণ দিন। সুযোগ থাকলে নিজের অফিসে নিয়ে যান একদিন। আমাদের চারপাশে অনেক অনেক পেশার মানুষ কাজ করে যাদের শিশুরা চিনে – যেমন রিক্সাচালক, দোকানদার, তার স্কুলের শিক্ষক থেকে শুরু করে আরও অনেকে। বিভিন্ন পেশার মানুষদের যখন চেনাবেন তখন তারা কিভাবে বা কি কাজ করার মাধ্যমে উপার্জন করে সেটিও শিশুকে বলুন।

২। এর পরের ধাপে শিশুকে বলুন যে যেহেতু কাজ করে টাকা উপার্জন করতে হয়, তাই টাকার পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়। আমরা চাইলেই তাই ইচ্ছামতো টাকা খরচ করতে পারবো না।

৩। যেহেতু টাকার পরিমাণ সীমিত, তাই প্রতি মাসে হিসাব করে বা পরিকল্পনা করে খরচ করতে হয়। এই পর্যায়ে এসে আপনি আপনার সন্তানদেরকে পরিবারের মাসিক খরচের সংক্ষিপ্ত হিসাব জানাতে পারেন । এক্ষেত্রে ছোট শিশু হলে (৩-৬ বছর) আপনি তাকে নিচের চার্টের মতো করে দেখাতে পারেন।

৪। টাকার মূল্য এবং বিভিন্ন সম্পদের মূল্য সম্পর্কে জানান শিশুকে। ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা বা ১০০ টাকার নোট চেনান। ১০ টাকা দিয়ে কি পাওয়া যায় দোকান থেকে? একটা চিপসের প্যাকেটও পাওয়া যায়,

আবার একটা পেনসিলও পাওয়া যায়। দুটো আলাদা জিনিসের একই মূল্য হতে পারে। আবার বিভিন্ন পেনসিলের দামও বিভিন্ন হতে পারে। কিন্তু সেগুলো সবগুলোই পেনসিল।

টাকার পাশাপাশি অন্য যেসব সম্পদ রয়েছে সেগুলোরও মূল্য রয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন গাছ, নদী, পানি ইত্যাদি যেগুলো রয়েছে সেগুলোরও মূল্য আছে। এইসব জিনিস না থাকলে আমরা কি ধরণের সমস্যায় পড়তে পারি সেটিও বলতে পারেন। তাই এইসব সম্পদ আমাদের হিসাব করে খরচ করতে হবে।

এই ধাপগুলো মেনে চলে আপনি নিয়মিতভাবে কথাচ্ছলে বা প্রতিদিনের নানা আলোচনায় আনতে পারেন। টাকার উপার্জন, ব্যয়, টাকার মূল্য এবং সঞ্চয়ের ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলুন। সন্তানের জন্য একটা ছোট্ট ব্যাংক কিনে দিন টাকা জমানোর জন্য। অথবা তার জন্য ব্যাঙ্কে একটি অ্যাকাউন্ট করে দিন যেখানে মাসে মাসে কিছু টাকা জমান সন্তানকে জানিয়ে। আর এভাবেই ধীরে ধীরে আপনার শিশুর মধ্যে ফাইনান্সিয়াল লিটারেসি তৈরি হবে যা পরবর্তীতে তার জীবনে অর্থনৈতিক সফলতা নিয়ে আসবে।

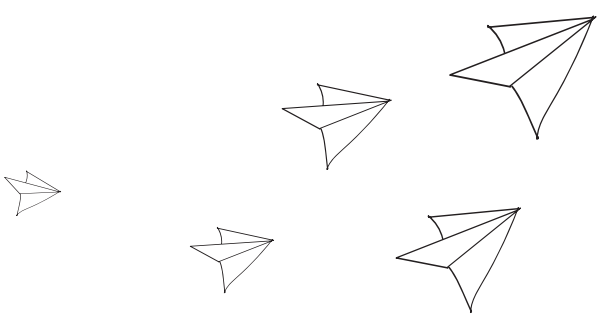

পরিবারের মাসিক খরচের তালিকা (তালিকার সিরিয়ালের নিচের লাইনগুলো আপনার পরিবারের খরচ অনুযায়ী লিখুন সন্তানকে নিয়ে)

খরচের তালিকা	টাকা
১। বাসা ভাড়া	
২। বিদ্যুৎ বিল	
৩। গ্যাস বিল	
৪। বাজার খরচ	
৫। যাতায়াত ভাড়া	

তালিকা এবং টাকা মিলিয়ে দেখুন কতটাকা খরচ হচ্ছে প্রতিদিন এবং প্রতিমাসে। বেশকিছু খরচের খাত থাকবে যেগুলো প্রতিমাসে প্রয়োজন হয়না। যেমন অসুস্থ হওয়া বা ঘুরতে যাওয়া। এ খরচগুলোও রাখুন এ হিসেবে। এভাবে আপনার সন্তান বুঝতে পারবে প্রতি মাসের উপার্জন থেকে পাওয়া সব টাকাই কেন আমরা খরচ করে ফেলবোনা।

সঞ্চয় করতে শেখা

শিশুর অনেক স্বপ্ন থাকে, থাকে অনেক ছোট ছোট লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পূরণে তাকে করতে হয় পরিকল্পনা। এবং সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অনেক সময় প্রয়োজন হয় টাকার। শিশু যেহেতু টাকা উপার্জন করে না, তার লক্ষ্য পূরণে যদি টাকার প্রয়োজন হয় তাহলে তার সঞ্চয় (saving) করা প্রয়োজন।

অভিভাবক হিসাবে অবশ্যই আপনি টাকা দিয়ে তার লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করতে পারেন। মনে করুন, আপনার সন্তান একটি নতুন খেলনা কিনে চাইছে। এটি আপনি তাকে সরাসরি কিনে দিতে পারেন, অথবা তাকে উৎসাহ দিতে পারেন সে যেন নিজে সঞ্চয় করে সেটি কেনার চেষ্টা করে অথবা ইতিমধ্যে যদি তার সঞ্চয় থাকে কোন শেখান থেকে কিনতে।

কেনার সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তাকে জিজ্ঞেস করুন এটি কি তার 'প্রয়োজন নাকি চাওয়া'।

শিশুকে সঞ্চয় করার উৎসাহ দেয়ার মাধ্যমে আপনি তার নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সাহায্য করছেন। যেসব শিশুদের ছোটবেলা থেকেই সঞ্চয়ের মনোভাব তৈরি হয়, পরবর্তী জীবনে তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক ভালো থাকে।

এই লেখায় আমরা আলোচনা করেছি কিভাবে আপনি অভিভাবক হিসাবে আপনার সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই সঞ্চয় করা শেখাতে পারেন এবং উৎসাহ দিতে পারেন।

১। শিশু যখন কোন টাকা উপহার হিসাবে পায় তখন তাকে সেটি খরচ না করে জমানোর জন্য উৎসাহ দিতে পারেন।

সাধারণত দুইভাবে সঞ্চয় করতে বলতে পারেন শিশুকে।

- তাকে একটি মাটির ব্যাংক কিনে দিন। সেখানে সে তার পাওয়া টাকা জমাতে পারে। তার যদি কোন কিছু কেনার লক্ষ্য থাকে তাহলে তাকে সরাসরি তা কিনে না দিয়ে তাকে তার ব্যাংক থেকেই নিয়ে কিনতে উৎসাহ দিন। তার কাছে যদি ১০০ টাকা থাকে এবং তার প্রিয় বলটি কিনতে যদি ১৫০ টাকা লাগে তাহলে তাকে বাকি ৫০ টাকা দিয়ে সাহায্য করুন।

- তার জন্য একটি অ্যাকাউন্ট করে দিন। সব ব্যাঙ্কেই এখন সরকার থেকে নিয়ম করে একটি 'শিক্ষার্থী অ্যাকাউন্ট' সেবা চালু করতে বলা হয়েছে যেখানে শিশুরা চাইলে প্রতি মাসে সর্বনিম্ন ২০ টাকা করেও জমাতে পারে। শিশুদের জন্য 'স্কুল ব্যাংকিং' নামে একটি সেবা চালু করেছে ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশে। আপনার সন্তানের জন্য এমন একটি অ্যাকাউন্ট করে দিন। সেখানে প্রতি মাসে তাকে টাকা জমানোর জন্য উৎসাহ দিন। ব্যাঙ্কে প্রতি মাসেই নানা কাজে আমাদের যেতে হয়। সুযোগ পেলে আপনার সন্তানকেও মাঝে মাঝে নিয়ে যান তার অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দেয়ার জন্য। এতে করে সে ব্যাংকের টাকা লেনদেন, জমানো, টাকা উঠানো এইসব ব্যাপারে অবগত হবে।

২। সম্পদের অপচয় না করেও সঞ্চয় করা যায় সেটি তাকে শেখান

খালি যে টাকা জমিয়েই সঞ্চয় করা যায় এমন নয়। আমরা আরও অনেকভাবেই সঞ্চয় করতে পারি।

শিশুকে শেখান যে পানি, বিদ্যুৎ এগুলো যে আমরা ব্যাবহার করি তার জন্য আমাদের টাকা দিতে হয়। তাই প্রয়োজন না হলে পানি অপচয় না করলেও টাকা কম খরচ হয়। টাকা কম খরচ করাও এক ধরণের সঞ্চয়। তার রুম থেকে বের হওয়ার সময় বা বাসার কোথাও এমনি এমনি ফ্যান, লাইট, টিভি চলতে থাকলে তাকে সেগুলো বন্ধ করার ব্যাপারে সচেতন করুন।

যদি দেখেন সে নিয়মিতভাবে এরকম লাইট, ফ্যান বন্ধ করছে সে জন্য তাকে প্রতি মাসে সে যে অপচয় বন্ধ করতে সাহায্য করলো সে জন্য ৫০ টাকা বা আপনার পছন্দ অনুযায়ী টাকা (খুব বেশি আবার যেন দিবেন না) উপহার দিন। তাহলে সে বুঝবে যে পানি বা বিদ্যুৎ অপচয় না করার জন্য সে এই টাকাটা বাঁচিয়েছে। তাই এটি তার সঞ্চয়। এরপর সেই টাকা তার মাটির ব্যাঙ্কে বা তার অ্যাকাউন্টে রাখার জন্য উৎসাহ দিন।

অথবা এই মজার খেলাটি খেলতে পারেন। বিদ্যুতের বিল দেখিয়ে তাকে বলতে পারেন যে প্রতি মাসে কত টাকা আপনাদের বাসায় খরচ হয় তার জন্য। তাকে একটা লক্ষ্য দিন যে সে কি বিদ্যুৎ অপচয় কমানোর মাধ্যমে পরের মাসে ১০০ টাকা বাঁচাতে পারবে কিনা। যদি পারে তাহলে সেই টাকাটা তার হবে।

৩। কোন কিছু ফেলে না দিয়ে ব্যবহার করা, বা Recycle করার মাধ্যমেও সঞ্চয় করা যায়

ঘরের অনেক জিনিস আছে যেগুলো আমরা চাইলে বার বার ব্যাবহার করতে পারি। অথবা কোন একটি জিনিসকে Recycle করতে পারি। শিশুরা নিজেরা অনেক কাগজ ব্যবহার করে। তাদেরকে কাগজ কিভাবে নতুন করে ব্যবহার করা যায় সে ব্যাপারে উৎসাহ দিন। প্লাস্টিকের বোতল, টয়লেট টিস্যুর রোল ইত্যাদি ব্যাবহার করে সে নতুন কিছু তৈরি করতে পারে। এ ব্যাপারে তাকে উৎসাহ দিন।

কাগজ কম ব্যবহার করলে কিভাবে সঞ্চয় হয়? শিশুর এই প্রশ্ন থাকতেই পারে। তখন তাকে বলুন যে কাগজ তৈরি হয় গাছ থেকে। গাছ কেটে শেখান থেকে আমরা কাগজ তৈরি করি। তাই আমরা যত কম কাগজ ব্যবহার করবো, তত কম গাছ কাটতে হবে। আর এতে করে পরিবেশের উপকার হবে। কারণ গাছ পরিবেশের অনেক উপকার করে। আমরা গাছ থেকে খাবার, অক্সিজেন অনেক কিছুই পাই। তাই কাগজ বার বার ব্যবহার করলে বা কম ব্যবহার করলেও যেহেতু কম গাছ কাটতে হয়, তাই এটিও এক ধরণের সঞ্চয়।

Recycle শেখানোর একটা অন্যতম উপায় হল শিশুকে ছোটবেলা থেকেই ক্র্যাফটের বিভিন্ন কাজে উৎসাহ দেয়া এবং তাকে সাহায্য করা।

তাহলে আশা করছি আমরা আপনাদের একটা বিস্তারিত ধারণা দিতে পেরেছি কিভাবে আপনার সন্তানদের সঞ্চয় করা খুব অল্প বয়স থেকেই শেখাতে পারবেন। শিশুর বয়স ৩ বছর হওয়ার পর থেকেই চাইলে আপনারা এই প্র্যাকটিসগুলো নিয়মিতভাবে করতে পারবেন। আর এতে করে আপনার শিশুর মধ্যে সঞ্চয় করার প্রবণতা তৈরি হবে, যা কিনা পরবর্তীতে তার জীবনে অর্থনৈতিক সফলতা আনতে সাহায্য করবে।

শুধু সন্তানের কাজের জন্য আলাদা একটি তালিকা তৈরি করুন আপনি আপনার সন্তানকে নিয়ে। এ কাজটা করার মাধ্যমে সে তার নিজের জন্য বরাদ্দ খরচ আর "দরকার বনাম চাওয়া" আসলে কিভাবে কাজ করবে তাও শিখবে ধীরে ধীরে।

নাম..... খরচের তালিকাঃ

খরচের তালিকা	**টাকা**
১। স্কুল	
২। খেলনা	
৩। চকোলেট	
৪। আইসক্রিম	
৫। কেক	

অধ্যায় ৬

শিশুর শেয়ারিং শেখা

১) শিশু অন্যর সাথে ভাগাভাগি করা শিখবেঃ

শেয়ারিং শেখা কেন এতো জরুরি?

বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি মামলা কি নিয়ে জানেন? জমি নিয়ে।

কাদের মধ্যে এই মামলাগুলো? নিজেদের আত্মীয়স্বজন, ভাই-বোনদের মধ্যে।

এবং সকল পারিবারিক কন্দোলের প্রধান উৎস কি?

এই জমি নিয়ে কিংবা সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা। এবং এই সম্পত্তি পাওয়ার লোভ।

কেন এই বড় মানুষেরা নিজেদের মধ্যে কোন্দল এবং অশান্তি করে? তারা কেন নিজের যতটুকু প্রাপ্য ততটুকুই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না? কেন তারা নিজেদের মধ্যে জমি বা সম্পত্তিগুলো শেয়ার করে না?

এটা গেলো জমির কথা। একই ব্যাপার দেশের প্রায় প্রতিটি বড় বড় কোম্পানিতে। বাবা হয়তো বিজনেস দাঁড়া করিয়েছেন। কিন্তু যখনই সন্তানরা আসে ব্যবসা দেখতে, তখনই শুরু হয় এই ভাগাভাগি। আর তা নিয়ে মারামারি। পরের জেনারেশনের মধ্যে ব্যবসা পুরাই লালবাতি।

যে পরিবারে ছোটবেলা থেকেই দুইটা জিনিস শেখানো হয় না শিশুদের, সেসব পরিবারে এটা হবেই। কোটিপতি পরিবার ধ্বংস হয়ে যায় এক জেনারেশনের মধ্যে। কয়েক একর জমির মালিকের নাতিরা এক টুকরা জমি পায় না।

কি সেই দুইটা জিনিস?

একটা হচ্ছে শিশুকে যদি সেলফ-কন্ট্রোল শেখানো না হয়।
আরেকটা হচ্ছে শিশুকে যদি শেয়ারিং করা শেখানো না হয়।

আপনি আগেই জেনেছেন কিভাবে সেলফ-কন্ট্রোল বা আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখাতে হবে।

আর এই চ্যাপ্টারে জানবেন কিভাবে শিশুকে শেয়ারিং শেখাতে হবে।

শিশুদের যে কেবল সঞ্চয়, টাকা জমানো এবং সঠিকভাবে খরচ করার ধারণা দিবেন এমন নয়। এটার পাশাপাশি শিশুকে উৎসাহ দিন তার কোন জিনিস অন্যর সাথে ভাগাভাগি করার জন্য। শিশুরা প্রায়ই নিজের খেলনা অন্য কারোর সাথে শেয়ার করতে চায় না, এমনকি নিজের ছোট-বড় ভাইবোনের সাথেও।

ছোটবেলার থেকেই শেয়ার করা বা অন্যর সাথে ভাগাভাগি করার জন্য

উৎসাহ দিন। তাকে বুঝান যে আমরা একজন অন্য আরেকজনের সাথে ভাগাভাগি করলেই বরং মজা আরও বেশি হয়। এবং অনেক সময় আমরা যদি ভাগাভাগি না করি তাহলে সবাই সবকিছুর আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে।

শিশুকে অল্প বয়স থেকেই দান করতে উৎসাহ দিন। তার পুরাতন খেলনা বা বই অন্য কাউকে যার 'দরকার' তাকে দান করতে বলুন। শিশুকে নিয়ে আজকেই বাছাই করে ফেলুন তার ব্যবহার উপযোগী পুরাতন খেলনা বা কাপড় কি আছে যেটি দান করা যাবে।

কিভাবে শেয়ারিং শেখাবেনঃ

৩-৭ বছরঃ শেয়ারিং শেখার বীজ বপনের সময়

এই বয়সটা শিশুর মধ্যে "আমিত্ব" প্রবলভাবে প্রকাশ পায়। সে ভাবে, 'এটা আমার!আমি দেব না!' — এইসব স্বাভাবিক। কারণ এখনো তার মস্তিষ্কের সেই অংশ পুরো বিকশিত হয়নি যা অন্যের অনুভূতি বোঝে। এখন আপনার দায়িত্ব হচ্ছে এই 'আমার' থেকে 'আমাদের' ধারণার বীজ বপন করা।

১। সন্তানের প্রতি আপনার চাওয়া জানানোঃ

এরজন্য প্রথমেই আপনাকে যা করতে হবে তা হল, "এক্সপেকটেশন কমিউনিকেশন" - অর্থাৎ আপনি আপনার সন্তানের কাছে কেমন আচরণ আশা করছেন তা অবশ্যই তাকে জানানো। আপনার সন্তান যখন তিন বছরে পা দিল তখন তার মাঝে আমিত্ব বা আমার এ ব্যাপারটা তৈরি হল। আপনি নিশ্চয়ই চাইছেননা সে সবকিছু শেয়ার করুক। নির্দিষ্ট কিছু জিনিস শেয়ার করুক সে, এটাই আপনার চাওয়া। তাহলে প্রথমে তাকে দেখান কি কি জিনিস সে শেয়ার করবে আর কোন কোন জিনিস শুধুমাত্র সে নিজে ব্যাবহার করবে। এ সময়টা তাকে এটাও শেখান কোন জিনিসটা তার কিন্তু অন্যকে শেয়ার করবে এবং কোন জিনিসটা তার না

হওয়া সত্বেও সে অন্যেরটা শেয়ার করে নিচ্ছে। এভাবে সে বুঝতে পারবে সে নিজেও অন্যেরটা নিচ্ছে বা শেয়ার করছে। তাই এ প্রসেসটা স্বাভাবিকভাবে নিবে।

২। নিজে রোল মডেল হওয়াঃ

আগেও বলেছি নিজেকে রোল মডেল হতে হবে। তারমানে যেরকম আচরণ আপনার সন্তান করুক আপনি চাচ্ছেন তা আপনাকেও প্রতিনিয়ত করে দেখাতে হবে। ছোট ছোট জিনিস শেয়ার করা বা দান করা একটা পারিবারিক প্র্যাক্টিসের মাঝে নিয়ে আসুন। এই যেমন ধরুন আপনার নিজের পুরাতন জামা, বই এসব দান করুন। সন্তানের জামাগুলো দান করার সময় তাকে নিয়েই আলাদা করুন কোনগুলো দান করবেন। এভাবে শেয়ার করাটা পারিবারিক একটা প্র্যাকটিসের মাঝে নিয়ে আসুন।

৩। প্রতিদিনের বিভিন্য কাজে শেয়ারিং মনে করিয়ে দেয়াঃ

আগে আমাদের পরিবারগুলো বড় ছিল। চাইলেই আলাদা রুম, আলাদা বিছানা বা নিজের প্রয়োজনীয় সবকিছু আলাদা পাওয়া যেতনা। এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন। না চাইলেও সবকিছু আলাদা থাকছে। তাই প্রতিদিনের কাজগুলোতে শেয়ারিং নিয়ে আসতে হবে ভেবে-চিন্তে।
এই যেমন ধরুন, শিশুকে যখন ছোট বাটিতে খাবার দিচ্ছেন তখন তা থেকে আপনিও হাতে নিয়ে একটু খেয়ে দেখুন। আবার অনেক সময় এমন হয়, বড় কেউ একজন হয়তো শিশুর কাছে কিছু একটা চেয়েছে। কিন্তু শিশু দিতে চাচ্ছেনা।আপনি বলে কয়ে তাকে রাজি করিয়েছেন দেয়ার জন্য। সে যখন এবার দিতে গেল তখন বড় মানুষটা বলল, না থাক তুমিই খাও। এভাবে শিশুটা দ্বিধাগ্রস্থ হয়। পরেরবার খাবার শেয়ার করতে সে স্বাভাবিকভাবেই আর চাইবেনা। তাই পারিবারিক এ ছোট ছোট আচরণগুলো সচেতনভাবে শিশুর শেয়ারিং আচরনকে যেন বাধাগ্রস্থ না করে তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

শেয়ার মানে কিছু হারানো না, বরং ভালোবাসা ও আনন্দ বাড়ানো—এই বার্তাটা যেন তার মনে গেঁথে যায়।

৮–১২ বছর: সংবেদনশীলতা ও সহানুভূতির বিকাশকাল

এই বয়সে শিশুরা নিজেকে একটু বড় ভাবতে শুরু করে। তার মধ্যে জন্ম নেয় দায়িত্ববোধ, ন্যায়ের বোধ এবং অন্যের অনুভূতি বোঝার ক্ষমতা। যৌক্তিক চিন্তার বিকাশ ঘটে এ বয়সে। এই সময়ই শিশুর কাছে শেয়ারিং হয়ে উঠে শুধু খেলনা ভাগাভাগির বিষয় নয়।তাই এসবের পাশাপাশি সময়, দায়িত্ব, সহানুভূতি শেয়ার করার শিক্ষাও এ বয়সে দিতে হবে।

কীভাবে শেখাবেন?

১। তাকে পারিবারিক দায়িত্বে যুক্ত করুন। যেমন ছোট ভাইবোনকে পড়াতে সাহায্য করা। বাবা-মায়ের কাজে সাহায্য করা। এভাবে সে দায়িত্ব নিতে ভয় পাবেনা। ছোট ছোট কাজ করার মধ্য দিয়েই আপনার সন্তান শেয়ার করতে শিখে যাবে।

২। দলগত কাজ আর খেলায় উৎসাহী করুন। অনেক শিশুই দলে খেলতে স্বাচ্ছন্দবোধ করেনা। আবার এ যুগে এসে দলে কাজের সুযোগটাও কম। তাই স্কুলে, গ্রুপ প্রোজেক্ট বা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে যেখানে দলে কাজের সুযোগ আছে সেখানে নিয়ে যান। এভাবে সে শেয়ারিং এ অভ্যস্ত হবে।

মনে রাখবেন, এ বয়সে আপনি দায়িত্ববোধ আর সহানুভূতির ভিত তৈরি করছেন।

১৩-১৮ বছর: গভীর শেয়ারিংয়ের শিক্ষা

টিন-এজ বা বয়ঃসন্ধিকাল এক ধরনের ঝড়ো সময়। শরীরে পরিবর্তন আসে, চিন্তাধারায় গভীরতা আসে, আবার আত্মকেন্দ্রিকতাও তৈরি হয় । এই সময় শিশুরা অনেক কিছু শেয়ার করতে চায় না—কারণ তারা ভাবতে শেখে, "আমার জায়গা আলাদা", "আমার কথা কেউ বুঝবে না ।" অথচ এই সময়টাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ—তাদের শেখানোর জন্য, কিভাবে গভীর সম্পর্ক তৈরি করতে হয়। এ সময়টায় আপনার সাথে সন্তানের সম্পর্কটার দিকে অনেক নজর দিতে হবে।

এখন তার কাছে শেয়ারিং মানে:

- অনুভূতি ভাগ করে নেওয়া
- নিজের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করা
- বন্ধু, পরিবার, এমনকি সমাজের প্রতি দায়িত্ব গ্রহণ করা

কীভাবে শেখাবেন শেয়ারিংঃ

১। সন্তানকে তার বন্ধুদের সঙ্গে টিমওয়ার্কে উৎসাহ দিন। এই যেমন—খেলাধুলা, প্রজেক্ট, বিতর্ক বা সামাজিক কাজে এ সময়টা নিজেও চেষ্টা করুন যুক্ত হতে। নিজের চিন্তা, বুদ্ধি আর সময়কে কাজে লাগাতে পারেন।

২। তাকে নিজের অনুভূতি শেয়ার করার সুযোগ দিন—জাজমেন্ট আর নেগেটিভ মন্তব্য ছাড়া শুনুন। নিজের ছোটবেলার গল্প শেয়ার করুন। খুব ভালো হয় একই ধরণের গল্প শেয়ার করলে। আপনি না হয়ে আপনার বন্ধুর গল্পও হতে পারে।

৩। অন্যের কষ্ট বোঝার চেষ্টা করা ও সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া। পরিবারের সদস্যদের অসুখে সেবা করা, স্বেচ্ছাসেবী কাজে যুক্ত হওয়া,অনাথ আশ্রমে কাজ করা বা গরীব শিশুদের পড়ানো এমন সামাজিক কাজে যুক্ত করতে পারেন এ বয়সে।

এ বয়সে তাদের শেখাতে হয়, "লিডার মানেই সবকিছু নিজের করে রাখা নয়, বরং ভাগ করে নেওয়ার ক্ষমতা।"
মনে রাখবেন, এ বয়সে শেয়ারিং-এর মাধ্যমে সম্পর্কের গভীরতা ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ তৈরি করা সম্ভব।

সবশেষে বলব, শেয়ারিং শেখানো মানে শিশুকে কেবল কিছু জিনিস ভাগ করতে শেখানো নয়, বরং তাকে এমন একজন মানুষে পরিণত করা, যে অন্যের প্রয়োজন অনুভব করতে পারে।

যে শিশু ছোটবেলা থেকেই শেয়ার করতে শিখে, সে ভবিষ্যতে—

- ভালো বন্ধু হয়
- দক্ষ টিমমেট হয়
- দায়িত্ববান নাগরিক হয়
- এবং পরিবারের শান্তি ধরে রাখে

শেয়ারিং শেখানো একটি চলমান প্রক্রিয়া। এটি একদিনে হয় না। কিন্তু যদি আপনি নিয়মিত ধৈর্য ধরে তার সাথে সময় দেন, নিজের মাধ্যমে উদাহরণ সৃষ্টি করেন, তাহলে একদিন সে নিজেই বলবে—

"আমারটা তোমার সাথে ভাগ করে নিতে চাই। কারণ আমরা একসাথে থাকলেই বেশি আনন্দ পাই।"

অধ্যায় ৬

সন্তানকে সুখী ও সফল মানুষ হিসাবে গড়ুনঃ গবেষণার আলোকে ২৫ টিপস

সব অভিভাবক চায় তার সন্তান সুখী ও সফল মানুষ হিসাবে গড়ে উঠুক। কিন্তু প্যারেন্টিং এডভাইস এখন ছড়িয়ে আছে চারপাশে। ইন্টারনেট থেকে শুরু করে সন্তানের স্কুলের বন্ধুর মা, কাজিন থেকে শুরু করে অফিসের কলিগ। আপনি কার কথা শুনবেন?

তাই আমরা অনেকগুলো সায়েন্টিফিক গবেষণার উপর ভিত্তি করে ২৫টি টিপস রেডি করেছি। এর বেশ অনেকগুলোই এসেছে আমাদের আগের লেখাগুলোতে। কিন্তু খুব গুরুত্বপুর্ণ দুইটা বিষয় আসেনি। সেটা হচ্ছে পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক এবং মা-বাবার নিজের মধ্যে সম্পর্ক।

আত্মবিশ্বাসী ও সুখী সন্তান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এদের অবদান অনেক বেশি। কারণ আপনার সন্তান সবচেয়ে বেশি শিখে আপনাদের দেখে। আপনি তাকে কি বলছেন সেটার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পরিবারের পরিবেশ এবং আপনি নিজে।

চলুন খুব দ্রুত এই ২৫টি টিপস দেখে নেই। এবং এগুলো নিজেদের জীবনে কাজে লাগাই প্রতিদিন।

টিপসগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১। নিজের ও পরিবারের সম্পর্কের টিপস
২। আপনার সন্তান সম্পর্কিত টিপস

নিজের ও পরিবারিক সম্পর্কের টিপস

১। নিজে সুখী হোন
সাইকোলজিস্ট ক্যারোলিন ও ফিলিপ কোয়ান গবেষণায় পেয়েছেন যে সুখী মা-বাবার সন্তানদের সুখী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অসুখী মানুষ অভিভাবক হিসাবে কম এফেক্টিভ।

"দ্য সিক্রেটস অফ হ্যাপি ফ্যামিলিস" নামের এক গবেষণায় শিশুদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তুমি যদি তোমার মা-বাবার ব্যাপারে একটা ইচ্ছাপূরণের ক্ষমতা দেয়া হয়, তাহলে তুমি কি চাইবে?
না, প্যারেন্টসরা তাকে বেশি সময় দিক, কিংবা তাকে স্বাধীনতা দিক – এটা শিশুরা চায়নি।

শিশুরা চেয়েছে তাদের মা-বাবা যেন আরও কম স্ট্রেসড আর টায়ার্ড থাকে।

২। দাম্পত্য সম্পর্কের সমস্যার সমাধান করুন
কেলি মুসিকের গবেষণা বলছে, যেসন শিশুর অভিভাবকদের মধ্যে খারাপ দাম্পত্য সম্পর্ক আছে, সেসব শিশুরা একাডেমিক্যালি খারাপ করে, ড্রাগসে আসক্ত হওয়ার প্রবণতা বাড়ে, এবং আবেগজনিত সমস্যায় ভুগে।
আপনাদের মধ্যে যদি প্রায়ই ঝগড়া হয়, সম্পর্কের টানাপোড়ন থাকে তাহলে এটা আজকে থেকেই দূর করার চেষ্টা করুন। আপনার বিয়ে

আর আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ দুইটাই নষ্ট হবে।

৩। আপনার বিয়েকে সন্তানের চেয়েও বেশি অগ্রাধিকার দিন

ওয়েস্টার্ন দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেস এখন ডিভোর্স রেট বাড়ছে খুব দ্রুত। এটা কয়েক বছর আগেও এতো মারাত্মক আকারে ছিল না।

ফ্যামিলি থেরাপিস্ট ডেভিড কোড বলছেন, "The greatest gift you can give your children is to have a fulfilling marriage."

আপনি যদি সুখী সন্তান গড়তে চান, তাহলে আপনার বিয়েকে প্রথমে গুরুত্ব দিন।

৪। পরিবার হিসাবে একসাথে সেলিব্রেট করুন

হ্যাপি ফ্যামিলি ছোট-বড় নানা উপলক্ষে একসাথে সেলিব্রেট করে। সেটা হতে পারে স্কুলের প্রথম দিন, ভালো গ্রেড পাওয়া, প্রোমোশন পাওয়া, কিংবা একসাথে কোথাও ঘুরতে যাওয়া।

হ্যাপি ফ্যামিলিই হ্যাপি শিশু তৈরি করে। তাই যখনই সুযোগ পান, ফ্যামিলি হিসাবে সেলিব্রেট করুন।

৫। পরিবারের সবাই মিলে একসাথে খান

বাবা-মা, সন্তান সবাই মিলে একসাথে খাবার খান। দ্য সিক্রেট অফ হ্যাপি ফ্যামিলিস বইয়ে আমরা দেখি যেসব পরিবারের শিশুরা একসাথে খাবার খায় তারা স্কুলে এবং স্কুলের বাইরেও প্রতিটি ক্ষেত্রে বেশি সফল।
একসাথে খাবার খাওয়া শিশুরা বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়, স্কুলে ভালো ফল করে। তাদের মধ্যে স্মোকিং, ড্রাগস, মদ্যপান এবং টিনেজ বয়সের রিস্কি আচরণগুলো কম করে, মানসিক সমস্যায় কম ভোগে।
এতো এতো ভালো ব্যাপার ঘটে খালি একটা কারণে – একসাথে খাবার

খাওয়া।

৬। একটা ফ্যামিলি মিশন স্টেটমেন্ট তৈরি করুন

দ্য সিক্রেট অফ হ্যাপি ফ্যামিলিস বইয়ে লেখক পরিবারের জন্য একটা মিশন স্টেটমেন্ট তৈরি করতে বলেছেন। এখানে পরিবারের ভ্যালু ও কালেকটিভ মিশনের উল্লেখ থাকতে হবে।

যেমন, আমাদের ফ্যামিলি মিশন স্টেটমেন্ট হচ্ছেঃ একে অপরকে রেস্পেক্ট করা (ভ্যালু) এবং পরিবারের সবাই মিলে সামনে এগিয়ে যাওয়া (কালেকটিভ মিশন)। এজন্য আত্মীয়স্বজনের উন্নতির জন্য প্রয়োজনে নিজের স্যাক্রিফাইস করা।

এটা কেন করা দরকার? কারণ একটা ফ্যামিলিতে যেটাকে বেশি প্রায়োরিটি দেয়া হয়, সেটাই শিশু শিখে কিংবা জীবনের ক্ষেত্রে ধারণ করে । যেমন যে পরিবারে রেজাল্টকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়, সেখানে শিশু প্রতিযোগিতা শিখবে। যে পরিবারে ভালো আচরণকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়, সেখানে শিশু অন্যর সাথে ভালো আচরণ করবে।

৭। নিয়মিত ফ্যামিলি মিটিং করা

প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটা ২০-মিনিটের মিটিং করুন পরিবারের সবাইকে নিয়ে। এমনকি এটা খাবার টেবিলে খেতে খেতেও করা যেতে পারে। তবে আলাদাভাবে করা বেশি ভালো।

এই মিটিংয়ে পরিবারের সবাইকে ৩টি প্রশ্ন করুনঃ

১। গত সপ্তাহে তুমি ভালো কি করেছো?
২। গত সপ্তাহে তুমি কোন জিনিসটি ভালো করতে পারোনি?
৩। আগামী সপ্তাহে তুমি কি নিয়ে কাজ করছো?

৮। শিশুর সাথে পারিবারিক ইতিহাস শেয়ার করুন

শিশুর সাথে আপনার পরিবারের সদস্যদের গল্প শেয়ার করুন। মা-বাবা কিভাবে দেখা হল, তাদের স্কুলের সময়ের কথা, দাদা-দাদী, নানা-নানীর কথা, এগুলো শেয়ার করুন।

আমি বড় হয়েছি জয়েন্ট ফ্যামিলিতে। বাবার কাছে, চাচাদের কাছে আমাদের পরিবারের স্ট্রাগলের গল্প শুনেছি। কিভাবে আমরা ধীরে ধীরে আজকের পর্যায়ে এসেছি। আমাদের কোন আত্মীয় আমাদের বাবা, চাচাদের কি সাহায্য করেছে।

আমার পরিবারে আমি ছোটবেলা থেকে দেখেছি আমার বাবা তার আত্মীয়স্বজনের জন্য কত কিছু করছে। তাদের উন্নতির জন্য নানাভাবে সাহায্য করছে। সেটাই এখন আমাদের মধ্যে এসেছে।

পারিবারিক বন্ডিং তৈরি হয় পরিবারের গল্পগুলো জানার মাধ্যমে। শিশুকে আপনার পরিবার, পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বিভিন্ন গল্পগুলো শুনান।

৯। পারিবারিক রিচুয়াল তৈরি করুন

ডঃ ডন ইকার এবং ডঃ লিন্ডা ওয়াল্টার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে পারিবারিক রিচুয়াল পারিবারিক বন্ধন বাড়ায় এবং শিশুর সোশ্যাল স্কিল বাড়ায়।

এরকম কিছু কমন নিয়মিত কাজ বা রিচুয়াল হতে পারেঃ

- সবাই একসাথে খাওয়া
- ফ্যামিলি গেম খেলা (লুডু, মনোপলি)
- বিকালে বা সন্ধায় হাঁটতে বের হওয়া
- বছরে একবার অন্তত পিকনিক করা
- প্রতি মাসে একবার সন্তানের সাথে ওয়ান-টু-ওয়ান সময় দেয়া

১০। সন্তানকে একজন মেন্টর বা রোল মডেল খুঁজে দিন

শিশু যখন ছোট থাকে, বিশেষ করে স্কুলে যাওয়ার আগে, তার রোল মডেল সাধারণত বাবা-মা হয়ে থাকে। এরপর বড় হতে থাকলে তার রোল মডেল বদলায়। স্কুলের একজন পছন্দের শিক্ষক কিংবা কাছের কোন আত্মীয়।

ডঃ লিসা কলারসি গবেষণায় পেয়েছেন যে, যে শিশুর জীবনে এমন বয়স্ক কেউ আছে যাকে সে বিশ্বাস করতে পারে, তার সাথে পরামর্শ করতে পারে, তাহলে সেই শিশুর লাইফ স্যাটিসফেকশন ৩০% বেড়ে যায়।

মেন্টর খুঁজে পেতে আপনার বন্ধুকে বলতে পারেন, তাকে কোন একটা আফটার-স্কুল, কিংবা স্কাউটিংয়ের সাথে যুক্ত করতে পারেন।

আপনার সন্তান সম্পর্কিত টিপস

সন্তানের সাথে করণীয় ১৫টি দৈনন্দিন কাজ যেগুলো তাকে সফল, সুখী ও আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে সাহায্য করবে।

১। সন্তানের কথা পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনুন

যখন আপনার শিশু আপনাকে কিছু বলবে তখন আপনার সাথের মোবাইল, সামনে থাকা ল্যাপটপ সরিয়ে রেখে তার কথা পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনুন। যখন আপনি এরকম করবেন তখন সন্তান বুঝবে আপনি তার কথা শুনছেন। এবং সে আপনার উপর বিশ্বাস করবে, আপনার সাথে সবকিছু শেয়ার করবে।

২। শিশুকে আবেগ নিয়ন্ত্রণ বা ম্যানেজ করতে শেখান

ইমোশনাল ইন্টিলিজেন্স বা আবেগীয় দক্ষতা একটা শিশুর ভবিষ্যৎ সফলতার সবচেয়ে বড় নিয়ামক। সেলফ কন্ট্রোল বা আত্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে অনেক কথা হয়েছে আগেই।

৩। শিশুকে মিনিংফুল রিলেশন তৈরিতে সাহায্য করুন
জ্যাক সংকফ ও ডেবরা ফিলিপস গবেষণায় পেয়েছেন যে শক্তিশালী ও মিনিংফুল সম্পর্ক একটা শিশুর গ্রোথ ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য খুব দরকারি।

৪। সন্তানকে সবকিছুর জন্য বাউন্ডারি সেট করে দিন
যেসব অভিভাবক সন্তান কি করতে পারবে কি পারবে না, এটার বাউন্ডারি সেট করে দেয়, সেসব অভিভাবকদের সন্তানরা আত্মবিশ্বাসী ও সফল হয়ে উঠে।
যেমন আমাদের সময় ছিল মাগরিবের আজানের মধ্যে ঘরে ঢুকতে হবে। কিন্তু আবার সবকিছুতে অতিরিক্ত কন্ট্রোলিং ক্ষতিকর। কিন্তু একটা বাউন্ডারি থাকা জরুরি।

৫। শিশু যেন পর্যাপ্ত ঘুমায়
যেসব শিশুরা পর্যাপ্ত ঘুমায় না তাদের ব্রেইন ফাংশন ঠিকমতো হয় না, ফোকাস করতে পারে না, ক্রিয়েটিভিটি কমে যায়, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, এমনকি মোটা স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়।
একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘুমানোর রুটিন করে দিন। খাওয়ার পর কোন স্মার্টফোন, কিংবা কার্টুন দেখানো যাবে না।
সন্তানের ঘুমানোর জায়গা অন্ধকার আর শান্ত রাখুন। তাতে ঘুম গভীর হবে।

৬। প্রসেসের উপর ফোকাস দিন, রেজাল্টের উপর না
ডঃ ক্যারোলের গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে, যেসব শিশু এফোর্ট দেয়ার উপর মনোযোগ দেয়, লং টার্মে তারা বেশি সফল হয়। তাই যখন সুযোগ পাবেন সন্তানের ভালো আচরণ, ব্যবহার, এফোর্টের প্রশংসা করুন। সময়ের সাথে সাথে তার রেজাল্টও ভালো হবে।

৭। শিশুকে খেলার জন্য বেশি সময় দিন
মোবাইল বা কম্পিউটার গেম না, শিশুকে ঘরের বাইরে খেলতে দিন বেশি বেশি। কিংবা আপনার বাসার মেঝেতে, কিংবা ছাদে। শিশুদের এই

খেলার কোন নিয়ম থাকতে হবে না।
যে শিশু ছোটবেলায় বেশি খেলা করে, সেই শিশু ভালো শিক্ষার্থী হয়। পাশাপাশি তাদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আবেগিয় উন্নয়নের জন্য সহায়ক হয়।

৮। সন্তানের স্ক্রিন টাইম কমান
সন্তানের সামনে উদারহণ তৈরির জন্য নিজের স্ক্রিন টাইম এবং টিভি দেখার সময় কমান। চার হাজার টিনেজারদের উপর একটা সার্ভে করে দেখা গেছে যারা বেশি টিভি দেখে, তারা বেশ ডিপ্রেশনে ভুগে।
স্ক্রিন টাইম কিংবা টিভি টাইমের সাথে শিশুর স্পিচ ডিলে, ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলাপমেন্ট সরাসরি সম্পর্কিত। এই যে আজকাল ৩০% শিশুর স্পিচ ডিলে দেখা যাচ্ছে, এর প্রধান কারণ হচ্ছে স্মার্টফোন আসক্তি।

৯। শিশুকে একটা Gratitude Journal মেইন্টেইন করান
ডঃ রবার্ট ইমন্স গবেষণায় দেখিয়েছেন যে মাত্র ১০ সপ্তাহেই আপনার হ্যাপিনেস ২৫% বাড়িয়ে দিতে পারবেন একটা ছোট্ট কাজ করে। কী কাজ? আপনি যদি একটা ডাইরি মেইন্টেইন করেন যেখানে আপনি নিয়ম করে প্রতি সপ্তাহে লিখে রাখবেন কোন কোন বিষয়ের জন্য আপনি কৃতজ্ঞ। তাহলে আপনার হ্যাপিনেস ২৫% বেড়ে যাবে।

চলুন শুরু করি নিজের Gratitude Journal.

- আমার পরিবারের জন্য আমি কৃতজ্ঞ
- আমার স্বাস্থ্যর জন্য আমি কৃতজ্ঞ
- আজকের মজার খাবারের জন্য আমি কৃতজ্ঞ

আপনার নিজের পাশাপাশি আপনার সন্তানকেও একটা এমন ডাইরি মেইন্টেইন করতে বলুন।

১০। শিশুকে তার নিজের পছন্দ বেছে নিতে দিন
ছোটবেলা থেকেই শিশুরা যদি নিজের পছন্দকে বেছে নিতে পারে,

তাহলে তার সিদ্ধান্ত নেয়ার সক্ষমতা তৈরি হয়। গবেষণায় দেখা গেছে শিশু যখন স্কুলের কলেজের সাবজেক্ট নিজে বেছে নেয়, তখন স্কুলে যাওয়া সে ২৪% বেশি উপভোগ করে। আমাদের দেশে ৩০% শিশু স্কুলে আনন্দ নিয়ে যায় না।

আপনার সন্তান যখন বড় হতে থাকবে, তখন তাকে নিজের সিদ্ধান্ত নিজেকে নিতে দিন। এতে করে তারা সফল ও সুখী হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে।

১১। শিশুকে অন্যকে সাহায্য করতে এবং অন্যর উপকার করতে উৎসাহিত করুন

ডঃ মার্ক হোল্ডার ৮-১২ বছর বয়সের শিশুদের উপর একটা গবেষণা করেছেন। সেখানে তিনি পেয়েছেন যে যেসব শিশুরা মনে করে তাদের জীবন বেশি মিনিংফুল তারা বেশি সুখী।

কখন তাদের কাছে জীবন বেশি মিনিংফুল মনে হয়?

যখন তারা অন্যর জন্য কিছু করে। যখন সে ভলান্টারি কাজ করে, বন্ধু কিংবা পরিবারকে সাহায্য করে।

ডঃ এল বি একনিন গবেষণায় পেয়েছেন যে শিশুরা যখন নিজের কোন জিনিস অন্যকে দিয়ে দেয়, তখন তারা বেশি খুশি হয়।

১২। হেলদি বডি ইমেজ প্রোমোট করুন

টিনেজার মেয়েরা নিজেদের ওজন নিয়ে আপসেট থাকে। তারা দেখতে কেমন ও তাদের ওজন নিয়ে নিজেদের মধ্যে নেগেটিভ বডি ইমেজ তৈরি হয়ে থাকে। একই সমস্যা ছেলেদের মধ্যেও থাকে।

হেলদি বডি ইমেজ কিভাবে প্রোমোট করবেন?

- সোশ্যাল মিডিয়া কিভাবে তাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করছে সেটা বুঝান।
- তাদের স্কিল ও ক্যারেক্টাররের উপর ফোকাস করুন, তারা দেখতে কেমন সেটার উপরে না।
- অন্য মানুষের শারীরিক গঠন নিয়ে সন্তানের সামনে কোন মন্তব্য করবেন না।
- ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুড পারিবারিকভাবে বয়কট করুন।
- এক্সারসাইজ করুন পরিবারের সদস্যদের নিয়ে।

১৩। শিশুর সাথে চিৎকার করবেন না

যখন আপনি শিশুর দিকে চিৎকার চেঁচামেচি করবেন তখন বাসায় এমন একটা পরিবেশ তৈরি হয় যেখানে শিশু নিজেকে নিরাপত্তাহীন ও উদ্বিগ্ন অনুভব করে।

খুব যদি রাগ হয়, তাহলে নিজেকে শিশুর সামনে থেকে সরিয়ে নিন। ১০ মিনিট পর নিজেকে শান্ত করে আবার কথা বলুন।

১৪। শিশুকে ক্ষমা করার শিক্ষা দিন

ডঃ মার্টিন, যাকে পজিটিভ সাইকোলজির জনক বলা হয়, তিনি ক্ষমাশীল হওয়াকে শিশুর সুখী হওয়ার মূল উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

যেসব শিশুরা ক্ষমা করে দিতে পারে তারা নেগেটিভ ফিলিংসকে পজিটিভ ফিলিংসে রূপ দিতে পারে। আপনার শিশুর সামনে রোল মডেল হোন।

পরিবার, আত্মীয়, প্রতিবেশি বা অন্য কারোর সাথে কোন সমস্যা থাকলে সেটা মিটিয়ে ফেলুন। নিজে ক্ষমাশীল হোন। আপনার শিশু আপনার কাছ থেকেই দেখে শিখবে।

১৫। শিশুকে পজিটিভলি ভাবতে শেখান

যেসব শিশু বেশি আশাবাদী, তারা জীবনে সুখী। তাই শিশুকে পজিটিভিটি শেখান। কিভাবে শেখাবেন?

- গ্রেটিটিউড জার্নাল মেইন্টেইন করতে বলুন
- কমপ্লেইন করবেন না
- গসিপ করবেন না
- পানি ফেলে দিলে, কিংবা প্লেট ভেঙ্গে ফেললে বড় সিন ক্রিয়েট করবেন না
- অন্যর মধ্যে ভালো দিক খুঁজে বের করুন
- শিশুর সাথে নিজের জীবনের চ্যালেঞ্জ শেয়ার করুন, এবং সেখান থেকে আপনি কিভাবে বের হয়ে এসেছেন সেই ঘটনা শেয়ার করুন

প্যারেন্টিং রিসোর্স

নিচে প্যারেন্টিং এবং শিশুর বিকাশে সহায়ক কিছু রিসোর্স শেয়ার করছি। আশা করি এগুলো অভিভাবকদের কাজে দেবে।

১। ToguMogu Parenting App

প্রেগন্যান্সি থেকে শুরু করে সন্তানের স্কুলে ভর্তি করার সময় পর্যন্ত অভিভাবকদের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। প্রথমবার যারা মা-বাবা হতে যাচ্ছেন, তাদের ক্ষেত্রে এগুলো আরও বেশি। ভালো মানের প্রোডাক্ট খুঁজে পাওয়া, ভালো ডাক্তার, ডে-কেয়ার, প্রি-স্কুল খোঁজা থেকে শুরু করে শিশুর বয়স উপযোগী বিভিন্ন বই ও খেলনা ইত্যাদি হাজারো ইস্যু থাকে।

এই সমস্যার সমাধান করতে বাংলাদেশে ToguMogu নামে একটি প্যারেন্টিং অ্যাপ চালু হয়েছে, অভিভাবকদের জন্য যেটা 'ওয়ান স্টপ সল্যুশন' হিসাবে কাজ করে। সবচেয়ে দারুন ব্যাপার হচ্ছে, সন্তানের বয়স অনুযায়ী অ্যাপটি আপনাকে বিভিন্ন সাজেশন দেবে। সাথে আছে গ্রোথ ট্র্যাকার, যেটি আপনার শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ট্র্যাক করবে এবং প্রতি সপ্তাহে ও মাসে আপনাকে নোটিফিকেশন দেবে।

প্যারেন্টিং নিয়ে অনেক অনেক ভিডিও ও কনটেন্ট রয়েছে অ্যাপটিতে। এগুলো আপনাকে সাহায্য করবে যেকোনো প্রশ্নের জবাব দিতে। তাছাড়া আপনি নিজেও পোস্ট দিতে পারবেন অ্যাপে। অন্য অভিভাবক ও এক্সপার্টরা আপনার সেসব প্রশ্নের জবাব দেবেন। অ্যাপটি আপনি আপনার ফোনে ডাউনলোড করে রাখতে পারেন।
লিঙ্কঃ https://togumogu.com/

Togumogu অ্যাপ টি ডাউনলোড করতে পাশের QR Code টি ডাউনলোড করুন।

২। Goofi Learning Products

সাধারণত ৩ বছর বয়স থেকেই শিশুকে প্রি-স্কুলে ভর্তি করার জন্য চিন্তাভাবনা শুরু করেন অভিভাবকরা। ৩-৮ বছর বয়সটা শিশুর বিকাশের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে শিশুর বিভিন্ন দক্ষতা যেমন সৃজনশীলতা, সমস্যা সমাধান, ভালো আচরণ ও অভ্যাস, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি গড়ে উঠে। পাশাপাশি তাদের একাডেমিক ফাউন্ডেশনও তৈরি হয়।

'গুফি' থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের সিরিজ এবং লার্নিং টয়গুলো এই বয়সের শিশুদের উপরের দক্ষতাগুলো তৈরি করতে সাহায্য করে। শিশুর বয়স উপযোগী, একটিভিটি-বেজড, এবং দারুণ এনগেজিং এই প্রোডাক্টগুলো আপনার শিশুর জন্য নিতে পারেন। ইতিমধ্যে বিশ্বের ৩০টির বেশি দেশের অভিভাবকরা গুফির প্রোডাক্টগুলো ব্যবহার করে উপকৃত হচ্ছেন।

গুফির পণ্য আপনি অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইনেও পাবেন। অনলাইনে খুঁজে পাবেন গুফির নিজের ওয়েবসাইটে। তাছাড়া রকমারি ও দারাজেও পাবেন।
অনলাইনের লিঙ্কঃ
https://goofiworld.com/

গুফির ওয়েব সাইট ভিজিট করতে পাশের QR Code টি স্ক্যান করুন।

৩। Teachers Time platform

এই প্লাটফর্মে টিচিং ও প্যারেন্টিং নিয়ে বাংলাদেশের সেরা সব ECD Expert, Teacher Trainer এবং Education Professional দের বিভিন্ন কোর্স আপনি অনলাইনেই করতে পারবেন। এখানে অনেক কোর্স রয়েছে যেগুলো সম্পূর্ণ ফ্রি। এছাড়াও কিছু কোর্স রয়েছে, যেগুলো খুব স্বল্পমূল্যে করে ফেলতে পারবেন।

একইসাথে আপনি যদি শিক্ষক হয়ে থাকেন কিংবা চাচ্ছেন ভবিষ্যতে শিক্ষকতা পেশায় যেতে, তাহলে টিচার্স টাইমে থেকে শিক্ষকদের কোর্সগুলো করতে পারবেন। টিচিং প্রফেশনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন এই কোর্সগুলো করার মাধ্যমে।

দেশেরজুড়ে কয়েকশো স্কুলের সাথে টিচার্স টাইমের কানেকশন রয়েছে যার মাধ্যমে এই স্কুলগুলোতেও আপনি টিচার হিসেবে কাজের সুযোগ পেতে পারেন।

সন্তানের সুষ্ঠু বিকাশ ও সুন্দর ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে এই প্ল্যাটফর্মে অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন করে রাখুন।

লিঙ্কঃ www.teacherstimebd.com

Teachers Time এর ওয়েব সাইট ভিজিট করতে পাশের QR Code টি স্ক্যান করুন।

৪। Kids Time

শিশুর সৃজনশীলতা এবং দক্ষতা বাড়াতে যে প্ল্যাটফর্মটি বাংলাদেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় সেটি হচ্ছে Kids Time । দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকেই অনলাইনে শিশুকে বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি করতে পারবেন। পাশাপাশি কিডস টাইম সেন্টারেও শিশুকে ভর্তি করতে পারবেন। ৪ বছর বয়স থেকেই শিশুকে কিডস টাইমে শিশুকে ভর্তি করানো যায়। কিডস টাইমের বিভিন্ন কারিকুলামের উপর ভিত্তি করে অনলাইনে সরাসরি ক্লাস নেন দেশের সেরা সব শিক্ষকরা। পাশাপাশি আমেরিকা ও সিঙ্গাপুরের কারিকুলাম অনুযায়ী ইংরেজি এবং গণিত কোর্সও এখানে করাতে পারবেন ।

বিস্তারিত জানতে লিঙ্কঃ www.kidstimebd.com

Kids Time এর ওয়েব সাইট ভিজিট করতে পাশের QR Code টি স্ক্যান করুন।

লেখক পরিচিতি

ওয়ালিউল্লাহ ভূঁইয়া

শিশুদের জন্য লেখেন। তাঁর লেখা বই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিশুদের পরম আনন্দ দিয়ে যাচ্ছে। প্যারেন্টিং নিয়ে কাজ করছেন কয়েক বছর ধরে। শিশুদের নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সৃজনশীলতা বাড়ানো নিয়ে বিভিন্ন কোর্স রয়েছে তাঁর। প্রচুর পড়াশুনা করতে ভালোবাসেন। বাবা হিসাবে নিজের শিক্ষাগুলোকে অন্য অভিভাবকদের কাছে পৌঁছে দিতে চান। কর্মজীবনে লাইট অফ হোপের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান।

তাহমিনা রহমান সাথী

তাহমিনা রহমান সাথী একজন শিক্ষা উদ্যোক্তা, শিশুতোষ বইয়ের লেখক, এবং লার্নিং এক্সপার্ট। তিনি কিডস টাইমের প্রতিষ্ঠাতা। শিশু শিক্ষা নিয়ে কাজ করছেন গত ১০ বছর ধরে। তার লেখা বইগুলো ইতিমধ্যে দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে দেশের বাইরের শিশু ও অভিভাবকদের কাছে জনপ্রিয়।

সফল সন্তান গড়ার সিক্রেট ফর্মুলা

ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি ফর চিলড্রেন

‘ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি ফর চিলড্রেন’ বইটিতে এমন একটা ফ্রেমওয়ার্ক দেয়া হয়েছে, যেটা ফলো করে আপনি আপনার সন্তানকে একজন সফল, সুখী ও ভালো মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে পারবেন।

একজন আত্মবিশ্বাসী (confident) শিশু কিভাবে তৈরি হয়, শিশুকে কিভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণ (self-control) শেখাবেন, কিভাবে সন্তান নিজের লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করবে, ফাইনান্সিয়াল লিটারেসি শেখাবেন কিভাবে - এই গুরুত্বপুর্ণ বিষয়গুলো ধাপে ধাপে পুরো বইয়ে তুলে আনা হয়েছে।

বিভিন্ন গবেষণা, এক্সপার্টদের মতামত, এবং লেখকদের দীর্ঘ এক দশক ধরে সরাসরি শিশু ও অভিভাবকদের সাথে কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে বইটি লেখা হয়েছে, যা অভিভাবকরা খুব সহজেই নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে কাজে লাগিয়ে সন্তানের ভবিষ্যৎ বদলে দিতে পারবেন।

অভিভাবকদের পাশাপাশি স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষা ও শিশুর বিকাশ নিয়ে কাজ করেন, এমন মানুষদেরও তাদের কাজের ক্ষেত্রে উপকারে আসবে।

Financial Literacy for Children
Waliullah Bhuiyan & Tahmina Rahman Sathi
Published by Light of Hope Ltd.
House 67/A, Road 9/A, Dhanmondi, Dhaka 1209, Bangladesh
To know more about Light of Hope Ltd.
visit: www.lightofhopebd.com

Related trademarks and design elements are licensed by Light of Hope Ltd.
© Light of Hope Ltd. all rights Reserved

Published by
Light of Hope